শনিবারের চিঠি

১৬ চৈত্র ১৩৯১ □ ৩০ মার্চ ১৯৮

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

আমাদের প্রকাশিত চিরায়ত গ্রন্থরাজি

* রচনাবলী – মানিক গ্রন্থাবলী (১৩ খণ্ডে সমাপ্ত) ।। বনফুল রচনাবলী (১৯ খণ্ড প্রকাশিত) ।। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ (৯ খণ্ড প্রকাশিত) ।। অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী (১০ খণ্ড প্রকাশিত) ।। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী (৪ খণ্ড প্রকাশিত) ।। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনাবলী (২ খণ্ড প্রকাশিত) ।। জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (২ খণ্ড প্রকাশিত) ।।

প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩০ টাকা। তালিকাভূক্ত গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সুবিধা রয়েছে ।

* বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবণের গবেষণা গ্রন্থ–অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত রবীন্দ্র-রচনা সংকলন –
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা-২৫ টাকা । রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তা-৩০ টাকা

* রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত ।। অধ্যাপক সতেন্দ্রনাথ রায় ।। ৩০ টাকা
রবীন্দ্র স্মৃতি ।। বনফুল ।। ১০ টাকা

* অধ্যাপক ড: সরোজমোহন মিত্রের–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য ।। ৩০ টাকা
সুকান্তের জীবন ও কাব্য ।। ১৫ টাকা শরৎসাহিত্যে সমাজচেতনা ।। ১৬ টাকা

* উপন্যাস –বনফুল হাটেবাজারে ৮ টাকা ।। গোপালদেবের স্বপ্ন ১০ টাকা ।। অধিক লাল ১০ টাকা ।। ত্রিনয়ন ৮ টাকা ।। গল্পসমগ্র (দুই খণ্ড প্রকাশিত) প্রতি খণ্ড ৩০ টাকা ।। পশ্চাৎপট (আত্মজীবনী) ২৫ টাকা ।।
–বুদ্ধদেব বসু বাসর ঘর ১০ টাকা ।। লাল মেঘ ১০ টাকা ।। কালো হাওয়া ১৫ টাকা ।। এলোমেলো জলতরঙ্গ (ছোটদের উপন্যাস) ১০ টাকা ।।
–প্রতিভা বসু : জন্মান্তর ১০ টাকা ।। যখন বসন্ত ১০ টাকা ।। স্মৃতি সততই সুখের ।। (আমেরিকা ও ইউরোপপের বিচিত্র ভ্রমন কাহিনী–দুই খণ্ডে। প্রতি খণ্ড ২০ টাকা এবং ৩০ টাকা ।।
–জগদীশ গুপ্ত : লঘুগুরু ও অসাধু সিদ্ধার্থ ১০ টাকা ।।
–নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : পদসঞ্চার ১২ টাকা ।।
–শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জনপদবধূ ১২ টাকা ।। কর্ণাটরাগ ৮ টাকা ।। নগরনন্দিনীর রূপকথা ১০ টাকা ।।
–নিরঞ্জন চক্রবর্তী : খেলাঘরের যাত্রী ৮ টাকা ।। প্রতিবিম্বের স্বাদ ৮ টাকা ।।

* কবিতা –অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : উত্তরায়ণ ১০ টাকা ।। নীল আকাশ ৮ টাকা ।। পূব পশ্চিম ৮ টাকা ।। আজন্ম সুরভী ৮ টাকা ।।
–বুদ্ধদেব বসু শীতের প্রার্থনা-বসন্তের উত্তর ১০ টাকা ।। যে আঁধার আলোর অধিক ৮ টাকা ।। মরচে পড়া পেরেকের গান ৮ টাকা ।।
–জীবনানন্দ দাস : আলো পৃথিবী ১০ টাকা ।।
–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সমগ্র কবিতা ১০ টাকা ।।

গ্রন্থালয় প্রা. লি. – ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট ।। কলিকাতা-৭৩

সূচীপত্র

মরজি মহল □ বনফুল ২৪

নূপুরের মত □ অনুলিখন অনুপমা দাশ ৩৬

পুষ্পবিলাপ □ নারায়ণ দাশশর্মা ২৮

প্রতিচ্ছবি অথবা সনাক্তকরণ □ দেবাশিস মৈত্র ৩৮

লিটল ম্যাগাজিন হইতে সাবধান □ কমল কুমার দত্ত ৩৫

প্রচ্ছদ কাহিনী: কলকাতা বন্দর.... চোরাই মালের বাজার.... পুলিশ ও প্রশাসনের সম্পর্ক.... শ্রমিক সংগঠন.... লাভ ও ক্ষতি.... ডি. সি. হানডা.... □ শুভাশিস মৈত্র, দীপক বসাক, শিখর কর্মকার, কাজু মুখোপাধ্যায় ৭

আজকের বিধানসভার অতীতের স্মরণীয় বিতর্ক □ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ৩১

স্পীকারের পদ □ ড: রণজিৎ বসু ৩

রাজমাতা বাংলা জানেন □ কাজু মুখোপাধ্যায় ৫

মানুষ মানুষের জন্য □ গৌতম সরকার ৪৫

হাজার হাজার বেকার যুবকের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা _ শম্ভুনাথ মাহাতো ৪০

রাজধানীর কড়চা অমৃত কুমার ৪২

সংবাদ সাহিত্য □ ৪৭

প্রচ্ছদের ছবি □ চন্ডী ঘোষ

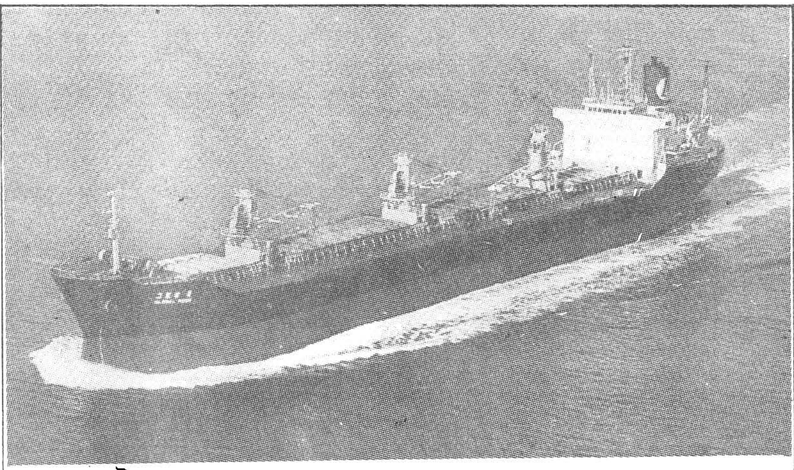

এই সংখ্যায়

কলকাতা বন্দর কি তলিয়ে যাচ্ছে? চোরা-কারবার আর কালো টাকার ছায়ায় ঢাকা পড়েছে কলকাতা বন্দর। প্রশাসনের চোখের সামনে গড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল চোরাই মালের বাজার। কলকাতা বন্দরের পুলিশ ও প্রশাসনের সম্পর্ক। কলকাতা বন্দরে জাহাজ চলাচলের সমস্যা। চুরি। বাংলাদেশের প্রাচীনতম শ্রমিক ইউনিয়ন, কলকাতা বন্দরের শ্রমিক সংগঠনের ইতিহাস। জাহাজ ব্যবসায়ের লাভ, ক্ষতি, ভবিষ্যৎ। এই হল প্রচ্ছদ কাহিনীর বিষয়।

আগামী সংখ্যায়

হলদিয়া কি হতে পারবে সম্ভাবনার সেই কেন্দ্রবিন্দু যা একদিন স্বপ্ন ছিল ড: বিধান রায়ের? আমাদের প্রতিবেদক প্রান্ত থেকে প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন হলদিয়ার মাটিতে নি:শেষ হয়ে যাবার প্রকৃত ছবিটি সংগ্রহের জন্য। কি ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে চাকরির সুযোগ। কি ভাবে ধুঁকছে সরকারি শিল্প। বন্ধ হয়ে গেছে নতুন শিল্পের পরিকল্পনা। 'হলদিয়া' শনিবারের চিঠির আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী।

বুর্বাক বৃহস্পতি ছদ্মনামের আড়ালে জনৈক অর্থনীতিবিদ রস-সাহিত্যিক রচিত কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে সরস এবং সুতীক্ষ্ণ একটি আলোচনা: **'বাজেট, বিড়াল ও শ্মশান।' বাজেটকে বাজে কিংবা জেটগতিসম্পন্ন যা হোক কিছু বলার আগে এই রচনাটি পড়ে নিলে পাঠকের সুবিধা হবে।**

বনফুল প্রকাশণী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে চিরন্তন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কম্প্যু কম্পোজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড ৯৬ রাজা রামমোহন সরণি কালকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ও ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কালকাতা-৭০০০১৩ থেকে প্রকাশিত। কার্যালয় ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কালকাতা-৭০০০১৩ ফোন ২৭-৪৯৪৩

দিল্লি অফিস সুনীল ভবন সি ১/১০৯-১০২ লাজপত নগর নয়া দিল্লি-১১০০২৪ ফোন ৬১৭৬৭১

ত্রিপুরা প্রতিনিধি: গোপাল বসু

দাম: দু'টাকা

পূর্বাঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল ০.৩৫ পয়সা

পূর্বাঞ্চল ও কলকাতা বাদে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল ০.৫০ পয়সা

কলকাতা ও হাওড়ার একমাত্র পরিবেশক পাতিরাম বুক স্টল (শ্যামল ভট্টাচার্য)

শনিবারের চিঠি

(প্রথম প্রকাশ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)

(নব পর্যায়) ১ম বর্ষ ২৩শ সংখ্যা

১৬ চৈত্র, ১৩৯১ □ ৩০ মার্চ, ১৯৮৫

সম্পাদক: চিরন্তন মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা: সাহিত্য ● রঞ্জনকুমার দাস; সংবাদ ● অজিত চক্রবর্তী

ব্যবস্থাপক: অরুণাংশু ঘোষ

প্রধান কর্মসচিব: শ্যামলী মুখোপাধ্যায়

অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা: আশিস মুখোপাধ্যায়

মুদ্রণ: শহীদুল ইসলাম

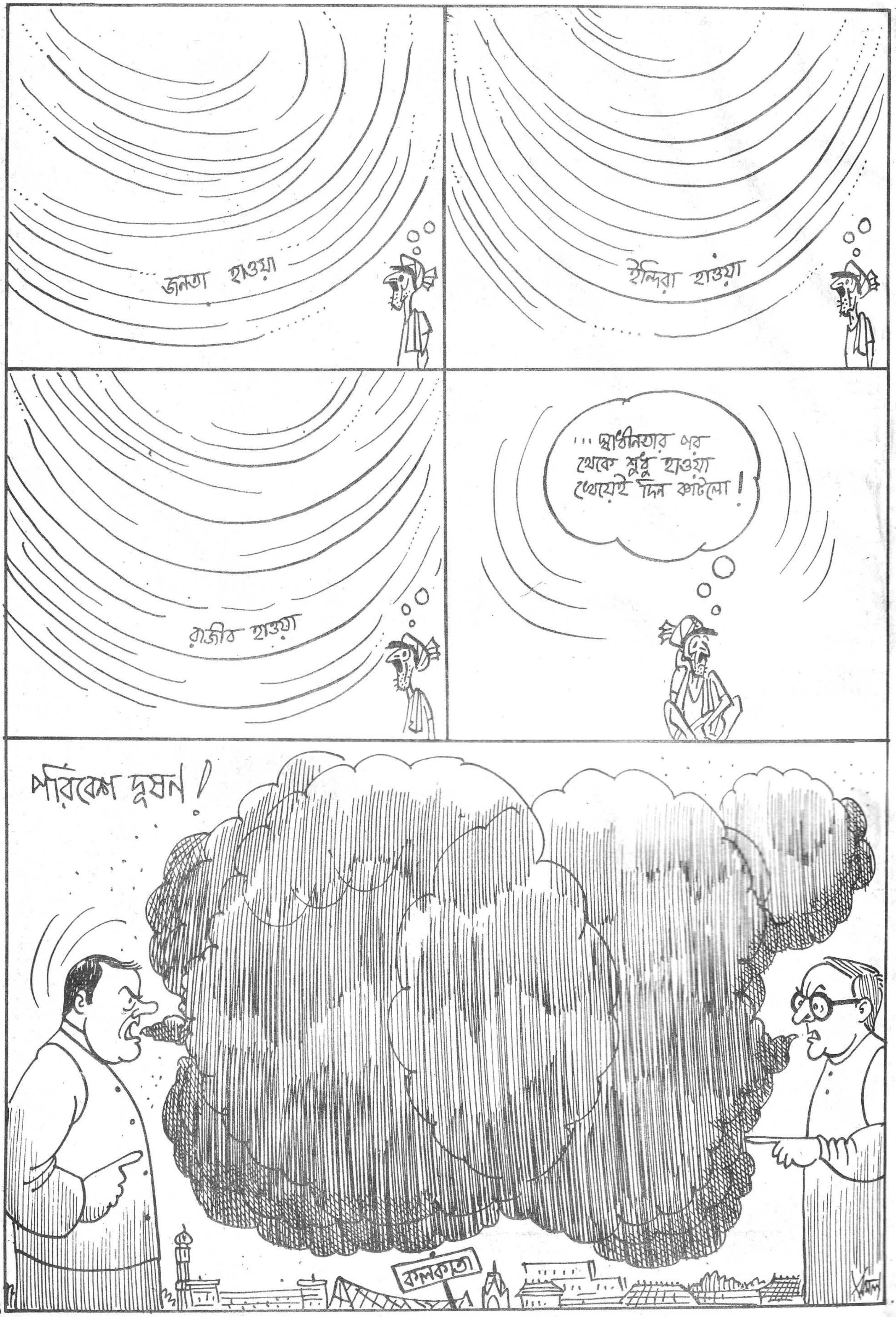
জনতা হাওয়া
ইন্দিরা হাওয়া
রাজীব হাওয়া
...স্বাধীনতার পর থেকে শুধু হাওয়া খেয়েই দিন কাটলো!
পরিবেশ দূষন!
কলকাতা

স্পীকারের পদ

ডঃ রণজিৎ বসু

বামফ্রন্ট দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর স্পীকারের পদকে কেন্দ্র করে হাসিম আব্দুল হালিম নতুন নজির সৃষ্টি করে ফেলেছেন। বিচার মন্ত্রী হাসিম আবদুল হালিমকে স্পীকার পদে মনোনীত করেন। স্পীকার পদে নির্বাচিত হয়ে তিনি কার্য পরিচালনা করছেন। আরও একটি কাজ বামফ্রন্ট করেছেন। স্পীকার সৈয়দ আবদুল মনসুর হাবিবুল্লা নির্বাচনে জয়ী হলেও তাঁকে স্পীকার পদে মনোনীত না করে মন্ত্রিসভার সদস্য করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে স্পীকার হওয়ার পর অনেকেই মন্ত্রী হয়েছেন কিন্তু ইতিপূর্বে একজনও মন্ত্রী হওয়ার পর স্পীকার হন নি।

বামফ্রন্ট কর্তৃক হালিমের মনোনয়ন সম্পর্কে পর্যালোচনা করার আগে ঈশ্বরদাস জালানের স্পীকার হওয়ার পর মন্ত্রী হওয়া সম্পর্কে তৎকালীন বিরোধী দলের মতামত একটু বিশ্লেষণ করা যায়। ১৯৫২ সালে জালান নির্বাচনে জয়ী হলেও তাঁকে কংগ্রেস মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন। তিনি স্পীকার ছিলেন। তাঁর এই নিয়োগকে বিরোধীদল (বর্তমানে ক্ষমতাসীন দল) তীব্র সমালোচনা ও কটূক্তিতে ভূষিত করেন। ১৭ জুলাই, ১৯৫২ ব্যঙ্গরস্বরে বিধানসভা কক্ষে তৎকালীন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গীয় সংসদীয় গোষ্ঠীর উপনেতা বঙ্কিম মুখার্জী বলেছিলেন, "একজন মন্ত্রী মিঃ জালান, তিনি তাঁর বক্তৃতায় পার্লামেন্টারি এটিকেট শেখাতে চেয়েছেন। তিনি স্পীকার পদের থেকে মন্ত্রীত্বের পদে উন্নীত হয়েছেন। তিনি আমাদের 'পার্লামেণ্টারী এটিকেটের' কথা শোনাচ্ছেন।"

৩১ জুলাই ১৯৫২ বিধান সভার কার্যবিবরণীতে দেখা যাচ্ছে মুখার্জী আবার বলেছেন, স্পীকারের পদ থেকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ একটি চরম অশোভনীয় ও প্রথা বিরোধী কাজ এবং আমরা ঐরূপ কোন ব্যক্তির কাছে থেকে কোনরূপ উপদেশাবলী শুনতে রাজী নই। স্বয়ং জ্যোতি বসুও জালানের প্রতি তীব্র শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছিলেন এই ব্যাপারে। বিধান সভার কার্যবিবরণীতে তাঁর ২০ মার্চ ১৯৫৯ বক্তৃতা পড়লেই তা দেখা যাবে।

আমাদের দেশে স্পীকারের পদ বৃটিশ ধাঁচে গঠিত হলেও এই পদের ক্ষেত্রে সে দেশের রীতি-নীতি অনুসৃত হয়নি। সে দেশে যে রীতি "একবার স্পীকার সব সময় স্পীকার" আমাদের দেশে রক্ষিত হয়নি। স্পীকার পদ থেকে মন্ত্রী হওয়া বৃটিশ গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু হাস্যকর কথা হল যে, স্পীকার পদের পর মন্ত্রীত গ্রহণকে যে রাজনৈতিক দল বিরোধী আসন থেকে "চরম অশোভনীয় ও প্রথা বিরোধী কাজ" বলে বর্ণনা করেছেন তাঁরাই আবার হবিবুল্লাকে স্পীকার পদের থেকে মন্ত্রীর পদে ব্রতী করেছেন। স্থান বদলের সঙ্গে অর্থাৎ বিরোধী থেকে সরকার পক্ষে গিয়ে বদলে গেল মতটা!

এবার আসা যাক যে নজির বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে সৃষ্টি করলেন সে সম্পর্কে। তাঁরা হালিমকে মন্ত্রী থেকে স্পীকার করলেন। সাংবিধানিক দিকটা একটু বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা পাঁচ বছর ধরে বহু সিদ্ধান্তই করেছেন যার দায়িত্ব হালিম সাহেবের। কারণ সংবিধানের ১৬৪(২) ধারা অনুসারে মন্ত্রীসভা সমষ্টিগতভাবে তাঁদের সিদ্ধান্তের দায়িত্ববাহী। এমন সিদ্ধান্তও থাকতে পারে যা তিনি নিজ দপ্তরে মন্ত্রীপদে থাকাকালীন গ্রহণ করেছিলেন। সে সমস্ত অনেক বিষয়ই বিধান সভার প্রশ্নোত্তর কালে বা বিধানসভা কার্যবলীর নানা পথে সভায় আলোচিত হচ্ছে। সে সময় তিনি সভাধ্যক্ষ হিসাবে সমাসীন যে আসন নিরপেক্ষতার পতাকাবাহী। এমতাবস্থায়, সভার কার্য তিনি নিরপেক্ষভাবে সম্পাদন করতে পারেন কি? ১৯৫৯ সালে স্পীকারের অপসারণমূলক প্রস্তাবের উপর তৎকালীন বিরোধীদলগুলি যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেটা মূলতঃ এই ছিল যে স্পীকার এমন একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত যা সরকারী সাহায্যপুষ্ট। অতএব তিনি নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে সমর্থ নন। এক্ষেত্রে সাংবিধানিক প্রশ্ন ছাড়া ঔচিত্যের প্রশ্ন আসাটা স্বাভাবিক। স্পীকার হবেন

ঈশ্বরদাস জালান

বর্তমান স্পিকার শ্রী হাসিম আব্দুল হালিম।

একজন দলনিরপেক্ষ ব্যক্তি। তাঁর অতীতের ইতিহাস হবে পক্ষপাতিত্বদোষমুক্ত। কিন্তু হালিম দলীয় সরকারের মন্ত্রীপদ থেকে স্পীকারের পদে সমাসীন হওয়ায় সে দল নিরপেক্ষতা প্রতিভাত হয় কি? পক্ষপাতভাবে সভার কাজে মনোনিবেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর কি? স্পীকার পদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যতাই ওই পদের প্রধান ও অপরিহার্য শর্ত। স্পীকার পদের সুনাম ও মর্যাদার জন্য শুধু নিরপেক্ষ একথা বলাই সব নয়, তিনি যে প্রকৃতই নিরপেক্ষ সেটা প্রতিভাত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে এমন একটা জিনিস ফুটে ওঠা উচিত যে তিনি প্রকৃতই নিরপেক্ষ। তাই কোন ব্যক্তির মন্ত্রী হওয়ার পরই স্পীকার হওয়া উচিত কি? নীতিগত ও ন্যায়সংগত দিক থেকে তিনি কি নিরপেক্ষভাবে সভার কার্য পরিচালনায় সমর্থ? নিরপেক্ষতার ব্যত্যয় ঘটাবার সম্ভাবনাই এই পদের ঐতিহ্যকে ম্লান করে থাকে। মনে হয় জ্যোতি বসুর একটি বক্তৃতায় বিষয়টি ভালভাবে পরিস্ফুট হচ্ছে। ২০ মার্চ ১৯৫৯ বিধানসভার কার্যবিবরণীতে দেখা যাচ্ছে বসু বলেছেন: অপোজিশনের যদি পাঁচজনও সদস্য বলে আপনার রুলিং সম্বন্ধে আমাদের আস্থা নেই, তাঁর উপর যদি এক, দুই বা তিনবার এরকম কোন ইংগিত থাকে, তাহলে কোথায় রইল স্পীকারের মর্যাদা? এদিক থেকে আমাদের জিনিসটা বিচার করতে হবে। সেজন্য আমি বলেছিলাম যে, নীতি এবং প্র্যাকটিস দুটো মিলিয়ে আপনারা বিচার করে দেখুন।

তারপর ধরুন আর একটা বলছি। এখানে আমরা বৃটিশদের কথা বলি—ওঁদের যা ভাল আইন-কানুন নীতি আছে তা আমরা নিয়ে থাকি। এ্যাংলো-স্যাক্সন জুরিসপ্রুডেন্সের একটা কথা আছে। 'Justice must not only be done but it must appear to havebeen done' এই যে এ্যাপিয়ারেন্স এটা দরকার। লোকে মনে করতে পারবে, চোখের সামনে দেখতে পাবে যে, হ্যাঁ জাস্টিস আছে। এটা একটা মস্ত বড় জিনিস। এ কথাটা তো বহুদিনের পুরনো কথা, এটা তো গ্রহণযোগ্য।

বিলাতের স্পীকার পদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নজীর আছে কি না সেটা একটু অনুধাবন করে দেখা যেতে পারে। উপস্থিত দুটি নজীর সামনে আসছে। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী গ্লাডস্টোন ৬ নভেম্বর ১৮৭১ সালে ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়াকে লেখা এক চিঠিতে জানাচ্ছেন যে তিনি (গ্লাডস্টোন) প্রচুর পরামর্শ গ্রহণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সরকারের কোন মন্ত্রীকে স্পীকার পদে মনোনীত করা সমীচীন হবে না। কারণ সে ক্ষেত্রে তাঁর নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকবে। এরকম নজির নেই যে মন্ত্রীপদ থেকে কেউ স্পীকার হয়েছেন। সংকটের সময় স্পীকারের পদমর্যাদাকে ধূলিসাৎ করার একটা প্রবণতা পরিলক্ষিত হবে এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে যে স্পীকারের পদ থেকে কোন বিশেষ কাজ করা হয়েছে সরকারের সুবিধার্থে। দ্বিতীয় নজীরটি হচ্ছে, ১৯ মার্চ ১৮৯৫ সালে তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইলিয়াম হ্যারকোর্ট এক চিঠিতে বৃটেনের রাণী ভিকটোরিয়াকে জানান যে তাঁর মন্ত্রীসভা নীতিগত কারণে মন্ত্রীসভার একজন সদস্যকে স্পীকার পদে বসানোর তীব্র বিরোধী।

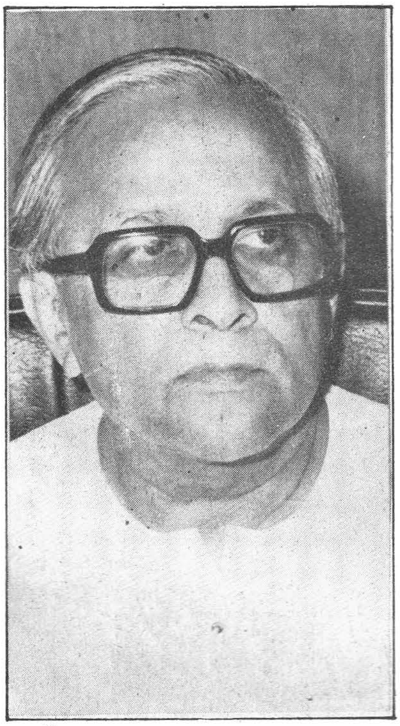

জ্যোতি বসু

এরকম নজীর কংগ্রেস দীর্ঘ রাজত্বকালে পশ্চিমবঙ্গে কখনও করেনি। ১৯৫৯ সালে স্পীকারের পদ শূন্য থাকায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্য ঈশ্বরদাস জালানকে স্পীকার পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। ১০ সেপ্টেম্বর এক চিঠি লিখে জালান মুখ্যমন্ত্রীকে স্পীকার পদ গ্রহণে তাঁর অক্ষমতার কথা জানান। সেই চিঠিতে স্পীকার পদ না গ্রহণে বিভিন্ন কারণের মধ্যে তিনি লেখেন তাঁর মন্ত্রীপদ থেকে ওই পদ গ্রহণ স্পীকারের পদের মত মহিমান্বিত পদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী হবে। যদি পুনরায় স্পীকার পদে ব্রতী হন সে সম্পর্কে তিনি সেদিন তাঁর দীর্ঘ চিঠিতে লিখেছিলেন:

"..........আমি নিশ্চিত যে বিরোধীরা আমাকে এবং সরকারকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সমালোচনা করার ভাল সুযোগ হাতে পাবে এবং আমি বিশ্বাস করি পূর্বাপেক্ষা সংগত কারনেই। যখন সভায় সরকারের কাজকর্ম কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হবে, মন্ত্রীসভার একজন প্রাক্তন সদস্য যিনি সংবিধানগতভাবে ঐ সবের দায়িত্ববাহী তিনি স্পীকারের চেয়ারে সমাসীন থাকবেন যে চেয়ার বিতর্কের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার প্রতিমূর্তি এবং তা হবে সমস্ত সংসদীয় শিষ্টাচার ও আদর্শের পরিপন্থী। তিনি সভার সকল অংশের আস্থা কখনই অর্জন করতে পারেন না যা একজন স্পীকারের সাফল্যের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিরোধীদের তাঁর নিরপেক্ষতার প্রতি কোন আস্থা থাকবে না। এমনকি আমার নিজের দপ্তরও সভায় সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে এবং চেয়ারে উপবেশনরত অবস্থায় তা হবে আমার পক্ষে হতবুদ্ধিকর। বিরোধীদের বিপক্ষে কোন সিদ্ধান্ত গেলেই আমার বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ উঠবে, আমাকে অপমান করা হবে, গালাগাল করা হবে যাতে তাঁরা অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন এবং এই কারণের জন্য বিদ্বেষ আরও অধিক হবে এবং আমি সভা ও জনগণের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হব। আমি মনে করি না এটা সরকারের পক্ষেও যুক্তিসংগত কাজ হবে তার মন্ত্রীসভার একজন সদস্যকে সরাসরি রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে স্পীকারের চেয়ারে পাঠান এবং সে রকম প্রচেষ্টাকে সরকার কর্তৃক বিরোধীদের "গ্যাগ" করার চেষ্টা বলে বর্ণনা করা হবে। সভায় শৃংখলা রাখার জন্য কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে এবং আমার প্রতিটি কাজকেই পক্ষপাতদুষ্ট চোখে বিচার করা হবে। আপনি জানেন আমার স্পীকার রূপে কার্যকালের সময়ে আমি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা এই পদের ঐতিহ্য রক্ষায় প্রয়াসী ছিলাম এবং এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক হবে যে আমি নিজেই তা লংঘন করছি। এটা এমন একটা পরিস্থিতি যা আমি অনুভব করি—সরকার অথবা আমার-কারো পক্ষেই সঠিক হবে না এবং গভীর ভাবে বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন......" এই চিঠি পাবার পর ডঃ রায় জালানকে ওই পদ গ্রহণের জন্য আর পীড়াপীড়ি করেননি। সেদিন এই ভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি শর্ত রক্ষিত হয়েছিল। বর্তমানে হালিম নির্বাচিত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান বিরোধীদলগুলি অনাস্থা প্রস্তবে নোটিশ দেন। শুধু তাই নয় যে ভাষায় স্পীকারকে আক্রমণ করা হয় যেমন 'ডিকটেটর' ইত্যাদি তাতে কি মনে হয় স্পীকারের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্যতা বিরোধীদলগুলির আছে? বিধানসভার গত বাজেট অধিবেশনে স্পীকারের বিরুদ্ধে অপসারণমূলক প্রস্তাব পেশ, আলোচিত ও ভোট হয় তাঁর নিরপেক্ষতার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যা

ইতিপূর্বে স্বাধীনতোত্তর পশ্চিমবঙ্গে আর কখনও হয়নি, কারণ শংকরদাস ব্যানার্জীকে কেন্দ্র করে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তা নীতিগত কারণে। কিন্তু হালিমের বিভিন্ন কাজকর্ম, পূর্বতন মন্ত্রীসভার সদস্য পদ ও আচারণের জন্যই এবার এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। এতে কি মনে হয় হালিমের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্যতা বিরোধী দলগুলির আছে?

এটি শুধু একটি খারাপ নজীর নয়, অগণতান্ত্রিকও। সবচেয়ে মজার ও হাস্যকর কথা যে দলগুলি বিরোধীদলে থাকার সময়ে স্পীকার পদের ঐতিহ্য সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য কথা বলেছিলেন তাঁরাই ক্ষমতাসীন হয়ে স্পীকার পদ সম্পর্কে দুটি সিদ্ধান্ত করেছেন যা সংসদীয় রীতিনীতিবিরোধী।

১৯৫৯ সালে তৎকালীন বিরোধীদলগুলি এই পদ সম্পর্কে একটা মূল নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্পীকারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিয়ে আসেন। স্পীকার শংকরদাস ব্যানার্জী সেই নীতি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পদত্যাগ করে ছিলেন। তার ফলে ভারতবর্ষে একটা উল্লেখযোগ্য নজীরের সৃষ্টি হয়েছিল। এই ভাবেই সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথার বিকাশ ঘটে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় বামফ্রন্টের এই সিদ্ধান্তগুলি এই পদের সম্মান ও ঐতিহ্যকে কোন্ দিকে নিয়ে চলেছে? এগুলি কি গণতান্ত্রিক প্রথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? □

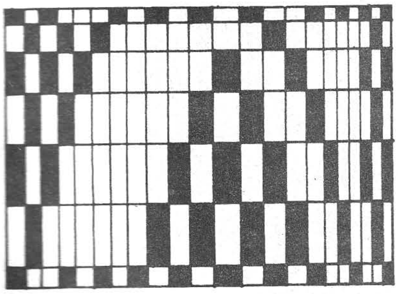

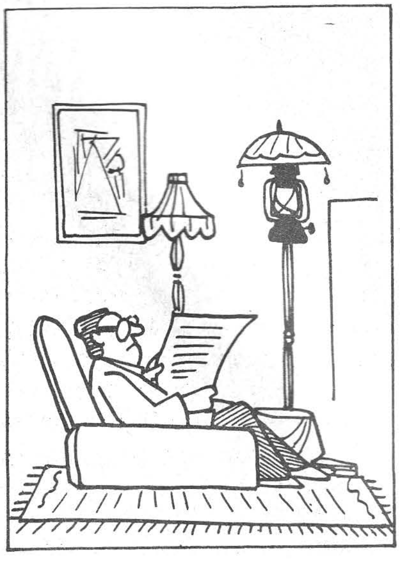

বাংলা জানেন রাজমাতা

ছবি : অলোক কুমার মিত্র

মহারাষ্ট্র নিবাসে বিজেপি নেতারা পরপর কয়েকটা দিন বিস্তর আলাপ আলোচনার পর কয়েকটা প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এই আলোচনায় অংশ নিলেও গোয়ালিয়রের রাজমাতা কলকাতায় কয়েকটা দিন পুজো আচ্চা করেই কাটালেন। নিউ আলিপুরে এক আত্মীয়ের বাড়ি উঠেছিলেন। সেখানে সবাই তাঁকে নিয়ে তটস্থ-ই ছিলেন। রাজমাতা সকাল-সন্ধ্যা পুজো করতেন। নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা। রাজ পরিবারের ঠাকুর রামচন্দ্র ভড়াই এসেছে সঙ্গে। আর তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী এক পরিচারিকা। তাঁদের কাছেই সব জানতে পারলাম।

নিউ আলিপুরে ডালমিয়া বাড়িতে রামচন্দ্র রাজমাতার নিত্য কর্ম পদ্ধতি প্রকাশ করল। রাত্রে কখন শোন, আর কখন ওঠেন, কেউ বলতে পারে না। মাঝে মাঝেই ওঠেন, পড়াশোনা করেন, আবার শুয়ে পড়েন। সেই জন্যে দু এক দিন উঠতে সাতটাও বেজে যায়। তবে সাধারণত: সকালেই ঘুম ভাঙ্গে। উঠেই স্নান, তারপর পুজোর পালা শেষ করেন। রামচন্দ্রের ডাক পড়ে আরো কিছু পরে। সে যে প্রাত:রাশ সাজিয়ে দেয়, তাতে থাকে শুধু ফল। রকমারি ফল দিয়ে তৈরি স্যালাড যার মধ্যে পপীতা অর্থাৎ পেঁপে থাকবেই। রাজমাতা, পাকা পেঁপে খুব পছন্দ করেন। আর থাকে কমলালেবু, মুসুম্বি, প্রভৃতি। মহারাজা বেঁচে থাকতে রাজমাতার ছিল অন্য চেহারা। ইংরেজ আমলে ওঁরা সেলুনে ছাড়া চাপতেন না। মহারাজা এবং মহারাণীর সঙ্গে থাকতো দুই প্রস্থ পরিচারক বাহিনী তখন মহারাণী আমিষ ভোজী। এখন তিনি সাধ্বী বিধবা। দুপুরে এবং রাত্রে সামান্যই আহার করেন। কদাচিত ভাতও খান তবে রবিবার এবংএকাদশীর দিন নুন অথবা চাল-গম গোত্রের কিছু খান না। লাঞ্চ অথবা ডিনারে সবচেয়ে যেটা বেশি চলে সেটা হল চালের মত সরু করা গমের পোলাও। ওঁরা বলেন দালিয়া। আর থাকে রকমারি সবজির একটা তরকারি। এখানে রাজমাতাকে দেওয়া হয়েছিল পটল, ট্যাঁড়স বিন প্রভৃতি। দালদা এবং আলুতে অরুচি, আপত্তি নেই বিশুদ্ধ ঘি-এ।

রামচন্দ্র বললেন, পুজো-আচ্চা, আহার-নিদ্রা এবং পুস্তক পাঠ বাদ দিলে বাকি সময় কাটে পার্টিবাজিতে। ওঁর সেক্রেটারি আংরেজি নিত্য কার্জসূচি তৈরি করেন, সেই মত মাতাজি মিটিংয়ের পর মিটিংয়ে ভাষণ দেন।

রাজমাতা কিন্তু নিজেকে নেতা বলে মনে করেন না। ধবধবে সাদা সিল্কের শাড়িতে সর্বাঙ্গ মুড়ে এসেছিলেন। কথা হয়েছিল সামান্যই। দেখে মুগ্ধ না হবার হেতু নেই। ষাট পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনো নিঃসন্দেহে পরমাসুন্দরী। গায়ের রঙ টকটকে কাঁচা সোনার মতন। শাড়ির রঙটাই শুধু সাদা নয়। লক্ষ্য করে দেখলাম পায়ের জুতোটাও সাদা। মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসেছিলেন। মনে হল চুলগুলো এখনো কালই আছে।

শুনে খুশি হলাম যে রাজমাতা কিছু বাংলাও জানেন। দু-একটা কথার জবাব বাংলাতে দিলেনও। হাসতে হাসতে বললেন, ফ্রান্সে একবার খুব বিপদে পড়ে ছিলাম। আমি কিছু ফ্রেঞ্চ জানি শুনে কয়েকজন ফরাসি ভাষায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুঁড়তে থাকলেন! আমি বললাম আপনার ভয় নেই, আমি বাংলায় বেশি প্রশ্ন করবো না।

দেখলাম রাজমাতা ইংরেজিটা খুব ভালই জানেন। বাংলাটা শিখেছিলেন বারাণসিতে। ১৯৩৮ সালের কথা। তখন বারাণসীর এ্যানি বেসান্ট উইমেন্স কলেজের ছাত্রী। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বাঙালি। তাদের কাছ থেকেই যা বাংলা শিখেছিলেন। কিন্তু 'ভুলে গিয়েছি' বললেও দেখলাম ওঁর বাংলা উচ্চারণ ঠিকই আছে। বারাণসি থেকে গিয়েছিলেন লখনৌ। সেখানে আই টি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু বি এ পরীক্ষার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। এ বি. এ.র আগে বিয়ে কথাটা রাজমাতার। এর থেকে বুঝতে পারলাম, বাঙালি সহপাঠিনীদের প্রভাব সহজে কাটবার নয়। বললেন আমি বি. এ. পাশ করিনি, অতএব আনাড়ি --

কিন্তু আনাড়ি হবেন কি করে? ওঁর বাবা সেই ইংরেজ আমলে ছিলেন ডেপুটি কালেকটর। দেশে বাবা ছিলেন বড় মাপের ঠাকুর। অর্থাৎ জমিদার। আদর্শবাদী, পিতার উপরওয়ালাদের সঙ্গে তাঁর কোনোদিন বনিবনা হয়নি। সারা জীবন ঝগড়াই করেছেন। কিন্তু বেঁচে ছিলেন অনেকদিন ৯৭ বছর অবধি তাঁকে পেনশান দিতে হয়েছে। উপরওয়ালারা বাগড়া দিতে পারেননি। তবে জীবনে কখনো প্রমোশন জোটেনি। কথায় কথায় 'ইয়েস স্যার' বললে হয়তো আই সি এস অথবা আই এ এস হতে পারতেন।

সুন্দরী, বিদুষী রাজমাতা সুবক্তাও। বক্তাদের তালিকায় নাম থাকলেই ভিড় হয়। নেতার মত ইমেজ আছে। কিন্তু নেতা হতে চান না। প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি কি, সব সময় পিছনের সীটেই বসবেন? দলের অনেকেই চান আপনি বি জে পির দায়িত্ব নিন। আপনি রাজি হচ্ছেন না কেন? বললেন, 'ম্যাঁয় নেতা নহী, কার্যকর্তা হুঁ।' বললাম, আপনি কি সেটা জাত বিচার করবেন। আপনি বিচার করবার কে? হাসলেন, কিছু বললেন না।

ডালমিয়ারা আগেই একটা কোল্ড ড্রিংক দিয়েছিলেন। সেটা শেষ করার কিছু পরেই, রাজমাতা চাপ দিলেন, বেলের সরবতটা শেষ করতে। কয়েকটা চুমুক দিয়ে বললাম, আপনার ছেলের সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করি অসন্তুষ্ট হবেন না তো? বললেন, তা কেন? বল। জানতে চাইলাম, ছেলে মাধব রাও সিন্ধিয়ার সঙ্গে আপনার গোলমাল কবে থেকে? বললেন, সেই যে ১৯৮০-তে রায় বেরেলি থেকে ইন্দিরাজির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন থেকেই ছেলে আমার বিরুদ্ধে। অনেক করে বলেছিল না দাঁড়াতে। রাজি হইনি। তখন থেকেই সম্পর্ক ছিন্ন হতে শুরু করে।

জরুরি অবস্থায় রাজমাতাকে জেলে থাকতে হয়েছিল। বললেন, না, ছেলে আমার জেলে যায়নি। জেলে যাওয়ার ভয়েই ও কংগ্রেসে ঢুকে যায়। এখন তো রেলমন্ত্রী

শুধু রেল নন, মাধব রাও সিন্ধিয়া বি জেপির এক নম্বর নেতা অটল বিহারি বাজপেয়িকে হারিয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর মা, ছেলের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারে নেমেছিলেন। অটল বিহারি নিজেও বিশেষ করে হিন্দু অঞ্চলে নিদারুণ জনপ্রিয়। মাধব রাওয়ের পক্ষে তাঁকে হারানো একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। রাজমাতা বললেন, গোয়ালিয়রে রাজবংশের এখনো খুব সুনাম। ওখানে রাজাকে কখনই প্রজাদের দাবি জানানোর অপেক্ষায় থাকতেন না। যা দেবার আগেভাগেই দিয়ে দিতেন। তাই মহারাজের ছেলের বিরুদ্ধে অটলজির জয়লাভ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তার উপর ছিল হাওয়া। তবে রাজমাতা মনে করেন, মা ও ছেলের মধ্যে লড়াই হলে কী হত বলা কঠিন। মেয়ে বসুন্ধরাও নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। মাধবরাও সিন্ধিয়া হেলিকপ্টারে গিয়ে সেখানে বোনের বিরুদ্ধে প্রচার চালান। রাজমাতার ধারণা তা না হলে বসুন্ধরাই জিততো।

চার মেয়ে এবং এক ছেলের মা। এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ত্রিপুরার রাজকুমারের। অল্প বয়সেই তার মৃত্যু হয়। এই মেয়ের জন্যও রাজমাতাকে মাঝে মাঝে কলকাতা আসতে হত। এখন আসা শুধু রাজনীতির টানে। তাঁর ধারণা, বিজেপির আদর্শ আছে যা একদিন না একদিন মানুষ গ্রহণ করবেই। তিনি অনন্তকাল অপেক্ষা করতেও রাজি আছেন কারণ তাঁর বিশ্বাস, 'দে অলসো সার্ভ হু অনলি স্টান্ড এ্যান্ড ওয়েট।'

সোয়া পাঁচটার বিমানে রাজ্য সভার সদস্য বিজয় রাজে সিন্ধিয়া দিল্লি যাবেন। খবর পেয়ে এক দঙ্গল মহিলা এসে গেছেন তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে। সকলেই অবাঙালি। সম্ভবত মাড়োয়ারি। সকলেই নতজানু হয়ে রাজমাতাকে প্রণাম করতে চান। দলে একজন বৃদ্ধাও ছিলেন। রাজমাতা কাউকে প্রণাম করতে দিলেন না। সকলকে নমস্কার করলেন। আমাকে বললেন, দিল্লি এলে দেখা কোরো। □

কাজু মুখোপাধ্যায়

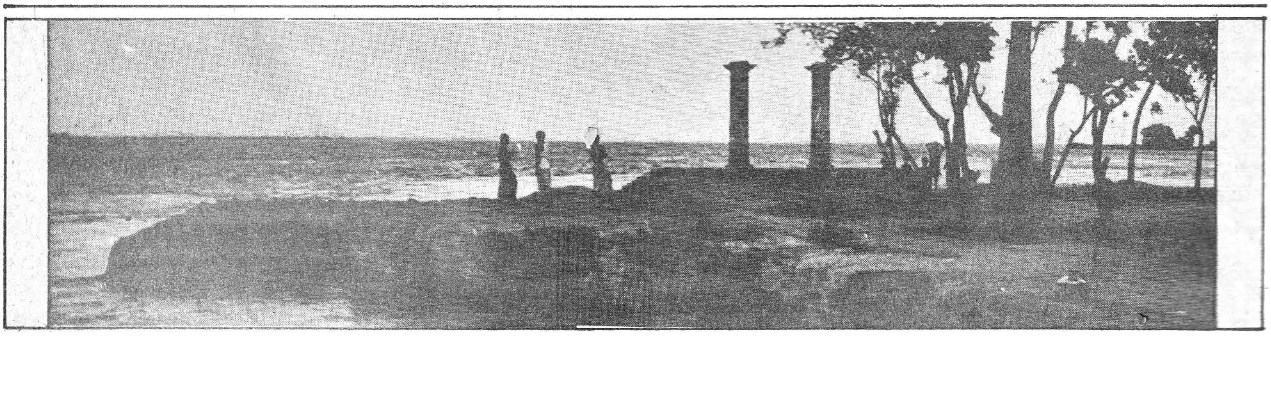

প্রচ্ছদ কাহিনী

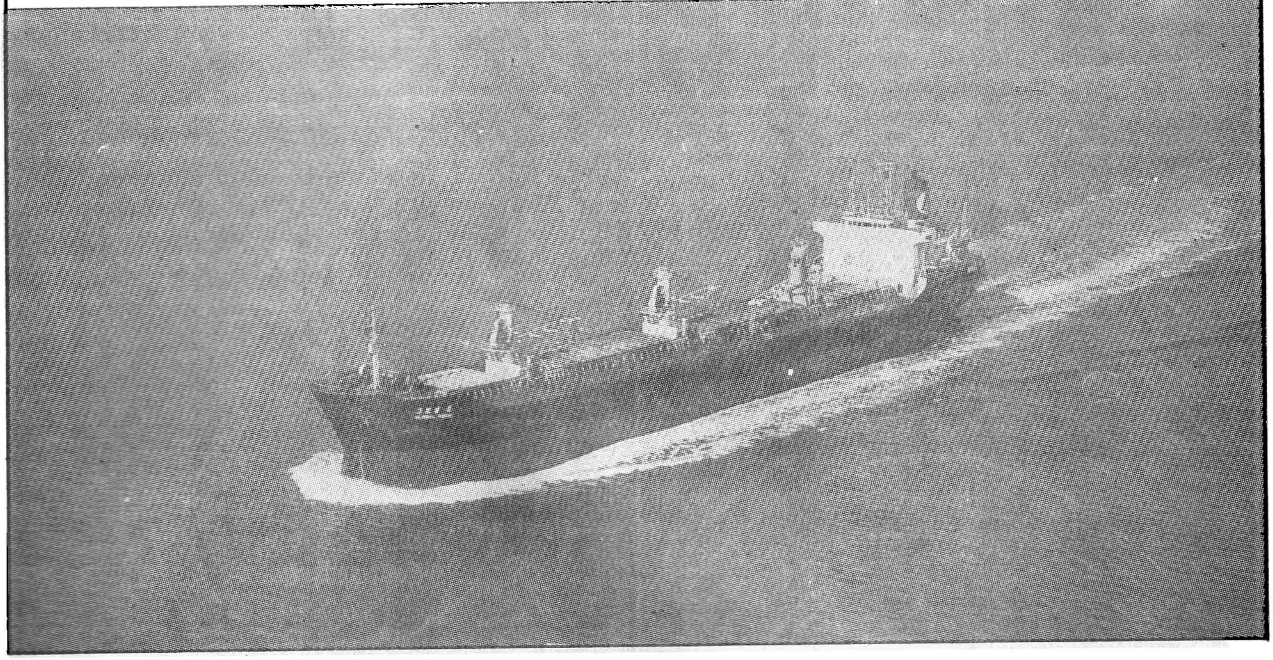

গতিহীন বন্দর

দীপক বসাক

গত বছরের পুরোটাই ভারতীয় বন্দরগুলির ঢিমেতালে কাজ করার ঝোঁক দেখা যায়।

তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে, ১৯৮২ সালে মোট ৯৭১টি কাজের দিন নষ্ট হয়। এই সংখ্যাই বেড়ে গিয়ে ১৯৮৪ সালে দাঁড়ায় ১,৫২৯ দিনে। এই ভাবে কাজের দিনগুলি নষ্ট হওয়ায় ভারতীয় বন্দরগুলি ছাড়াও বিদেশের বন্দরগুলিরও পূর্ব নির্ধারিত কার্যসূচি পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই ধীরগতির কাজের জন্য শতকরা ৪৩ ভাগ দায়ি বন্দরে মাল ওঠানো-নামানোয় অনাবশ্যক দেরি, এবং শতকরা ৫ ভাগ সময় নষ্ট হয় বন্দরে স্ট্রাইক সহ অন্যান্য নানা অসুবিধার দরুণ।

উল্লেখিত কাজের দিনগুলি নষ্ট হওয়ায়, শুধুমাত্র ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে, অর্থাৎ বন্দরের ভাড়া দিতেই কলকাতার ইণ্ডিয়া স্টীমশিপ কোম্পানির মত কোম্পানির খরচ পড়েছে আট কোটি টাকা। তবু তো এই হিসেব থেকে বাংকার ভাড়ার টাকা বাদ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে হিসেব করলেই বোঝা যাবে যে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানিগুলোর ক্ষতির পরিমাণ কম করেও ৩৫ কোটি টাকা হয়েছে। এও শুধুমাত্র কাজে দেরি হওয়ার জন্য বন্দরের ভাড়া হিসেবেই গুণতে হয়েছে জাহাজ কোম্পানিগুলোকে।

এদিকে, বিদেশের অন্যান্য বন্দরের সংগে তুলনা করলে দেখা যায় যে ভারতীয় বন্দরগুলির কাজকর্ম বিদেশী বন্দরে কাজকর্মের তুলনায় ৩০ শতাংশও নয়।

ভারতীয় জাহাজ কোম্পানিগুলির দুরবস্থা সম্পর্কে সরকার ওয়াকিবহাল আছেন। যদিও সারা বিশ্বেই এই ব্যবসায় এখন যথেষ্ট মন্দা চলছে। তবুও ভারতে অবস্থাটা আরো জটিল। এই জটিলতার উদ্ভব হয়েছে প্রধানতঃ এত বেশি কাজের দিন নষ্ট হওয়ায় এবং বন্দরগুলিতে কাজ কম হওয়ায়।

সরকার এই সমস্যার সমাধানে নানা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা এই ব্যবসাকে বাঁচাবার জন্য নানা নতুন নতুন প্রকল্পও নিচ্ছেন। যথা টাকা ঋণ নেওয়ার এবং তা শোধ করার জন্য নানা সুবিধাজনক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে সত্যিকারের কাজ হবে তখনই যখন সরকার বন্দরগুলিতে বেশি সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারবেন এবং একই সংগে বন্দরের বাণিজ্য বাড়বে। এটা খুবই আশ্চর্যের কথা যে বন্দরগুলির যার প্রধান সাহায্যের প্রয়োজন সব থেকে বেশি। সেখানেই কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই সাহায্যেরই সবচেয়ে বেশি অভাব। উদাহরণ হিসেবে বম্বের বন্দরের নাম করা যেতে পারে। এখানে প্রায় ৩০০ কোটিরও বেশি টাকা জমা আছে এবং শোনা যায় সেই টাকা থেকে অন্যান্য পোর্ট ট্রাস্টগুলিকে ধার দেওয়া হয়, কিন্তু বম্বের নিজের বন্দরের উন্নতির যথেষ্ট প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সেখানে টাকা খরচ করা হয়না।

মাঝে মাঝেই নানা মহল থেকে চেষ্টা করা হয়েছে যে বম্বের বন্দরের ব্যবহার-আইন করে কমিয়ে, বন্দরের ভার কমাতে। জাহাজগুলিকে অন্যান্য বন্দরে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু এতে বন্দরের উন্নতি সাধন হতে পারে না। বম্বেতে ব্যবসার সম্ভাবনা বেশি থাকায় এই বন্দরকে আরো বেশি ব্যবহারের উপযোগী করে তোলাই কি উচিত নয়? যখন বম্বে বন্দরের হাতে বাড়তি অনেক টাকাই আছে, তখন সে টাকা বন্দরের আধুনিকীকরণে যে কেন খরচ হয়না সেটাই অবাক হওয়ার বিষয়। এই টাকা দিয়ে

আধুনিক যন্ত্রপাতি যথা ফর্ক লিফট ক্রেন এবং আধুনিক গুদামঘর -- যেখানে জাহাজের মালগুলি রাখা যায় প্রয়োজন মত এবং বন্দরের কার্যক্ষমতাকে বাড়ানোর চেষ্টা এখনই করা উচিত। এই কাজের জন্য সরকারের নগণ্য ব্যয় হবে, কিন্তু কাজগুলো হলে বন্দরের সঠিক ব্যবহার সম্ভব এবং গুদামঘর হওয়ার ফলে জাহাজগুলোরসুবিধা তো হবেই, এছাড়াও বন্দরগুলোর আয়ও অনেকাংশে বেড়ে যাবে।

বন্দর আটকে খালি জাহাজ পড়ে থাকলে, তা কোনো পোর্ট ট্রাস্টের পক্ষেই লাভজনক নয়, আর জাহাজ কোম্পানিগুলোর পক্ষে তো নয়ই। এদিকে কলকাতা বন্দরের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। এই বন্দর প্রচুর লোকসানে চলছে কিন্তু এখানে নবীকরণের কোনো চেষ্টা নেই। বন্দরে কাজকর্মের জন্য যা যন্ত্রপাতি আছে, সবই বিফল এবং এতই প্রাচীন যে তার মূল্য বোধহয় শুধু কোনো যাদুঘরই দিতে পারে। মাদ্রাজে নির্মিত কনটেনার টার্মিনালটি আধুনিক করণের প্রথম সঠিক পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু সারা দেশে এই একটি মাত্র টার্মিনাল হওয়ায় এটিই এখন একছত্র অধিপতি। এই টার্মিনালের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মত সারাদেশে আর টারমিনাল না থাকায় এখানকার দামের সঙ্গে পাল্লা দওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। অতএব এরকম কয়েকটা টার্মিনাল দেশের অন্যান্য বন্দরে তৈরি করালে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাওয়া যায় এবং বিদেশী জাহাজগুলি এই সুযোগ পেলে দেশের নতুন আয়ের পথও আরও সুগম হতে পারে।

সরকার এই ব্যবসায় আর্থিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেও জাহাজের মালিকদের অনুরোধ যে সরকার যেন বন্দরের রক্ষণা-বেক্ষণের দিকে বেশি নজর দেন এবং বন্দরের কাজকর্মে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

জাহাজের মালিকদের মতে, সরকারের আর্থিক সাহায্য দানে সাময়িক ভাবে হয়ত বা জাহাজ কোম্পানিগুলোর কাজে লাগতে পারে কিন্ত এই সমস্যা সমাধান করতে হলে এর গভীরে যেতে হবে এবং গোটা বন্দরেরই খোল নলচে পাল্টে নতুন রূপ দিতে হবে। যতদিন পর্যন্ত বন্দরের বাণিজ্য তিন গুণ না হক, অন্ততঃ দ্বিগুণ করা যাচ্ছে ততদিন সরকারি সাহায্য পেলেও এই ব্যবসা ধুঁকতেই থাকবে। □

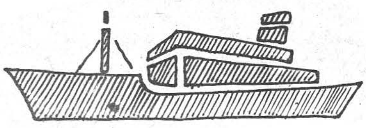

কলকাতা বন্দরের জন্ম-কথা

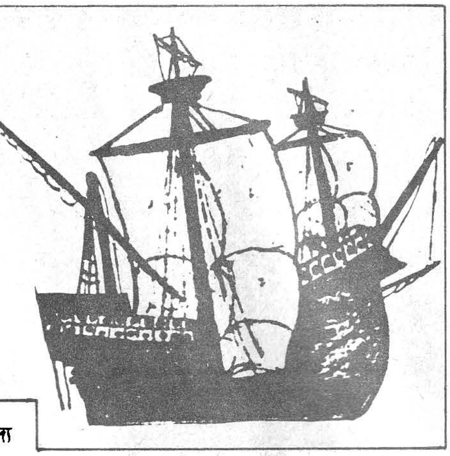

স্যার সি. সি. স্টিভেন্স-এর পেপার অন দ্য পোর্ট অফ ক্যালকাটা থেকে জানা যায় ভেনিসিয় বনিক সেসারে দেই ফেদারিসি ১৫৬৫ খৃস্টাব্দে সম্ভবত প্রথম সপ্তগ্রাম বন্দরে জাহাজ নোঙর করেছিলেন। তখন থেকেই পর্টুগিজ বণিকরা এদেশের বিভিন্ন বাজার থেকে ইয়োরোপে বিক্রির জন্য তুলো, চিনি, আমলা, লঙ্কা, মাখন, তেল এবং অন্যান্য পণ্য কিনতে শুরু করেছিল। সে সময় সপ্তগ্রামের পর্টুগিজ নাম ছিল। 'পোর্টো পিওগুয়েনো' বা ক্ষুদ্র বন্দর। সপ্তগ্রাম বন্দর ছাড়াও উড়িষ্যার হরিশপুরগড় বন্দর, গার্ডেনরিচ বন্দর তখন বিদেশী বণিকরা ব্যবহার করত। তবে ইংরেজ শাসন শুরু হবার পর ধীরে ধীরে এই বন্দরগুলো গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সপ্তগ্রাম বন্দর পরিত্যক্ত হয় সরস্বতী নদীর গর্ভ ভরাট হয়ে যাওয়ায়।

ইংরেজ বাণিজ্য জাহাজ প্রথম প্রথম বাণিজ্য চালাত বালেশ্বর থেকে। কারণ হুগলী নদী বেয়ে এতটা ভেতরে আসতে তখনও ইংরেজরা সাহস পেত না। বেশ কয়েক বছর বাদে ১৬৬২ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সব জাহাজ হুগলীর নিমজ্জিত চর পার উজানে ও ভাটিতে যাওয়া আসা করবে তাদের প্রতি টন পণ্য বহনের অতিরিক্ত দশ সিলিং করে শুল্ক দেওয়া হবে। এতে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তেমন কোন ফল পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে হুগলী নদীতে জাহাজ চালানয় উৎসাহ দেবার জন্য স্থির করা হয় যুবকদের পাইলটের কাজ শেখায় উৎসাহ দেওয়া হবে। তাদের প্রথম তিন বছর ছয় পাউন্ড, পরবর্তী দুই বছর সাত পাউন্ড এবং শেষ দুই বছর আট পাউন্ড করে মাইনে দেওয়া হবে।

এ ধরনের নানান লোভ দেখানোর ফলে ১৬৭৮ সালে প্রথম বৃটিশ জাহাজ ঐ রাস্তার ৪০,০০০ পাউন্ড মূল্যের পণ্য নিয়ে কলকাতা বন্দরে পৌঁছায়। ঐ বছরেই কোর্ট নির্দেশ দেয় জাহাজীদের মধ্যে সব থেকে কম মদ্যপ যাঁরা তাঁদেরই যেন পাইলটের কাজে নিয়োগ করা হয়। এই সব কিছু করার উদ্দেশ্য ছিল হুগলীর নিমজ্জিত চর অতিক্রম করবার মত দারুণ কঠিন কাজের যোগ্য পাইলট খোঁজা।

বাংলাদেশে বাণিজ্যের একমাত্র অধিকার পেয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এটা হয়েছিল ১৬৬১-র সনদ অনুসারে আর প্রায় ১৫ বছরের মধ্যেই কোম্পানির মূলধন বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫,০০০ পাউন্ড। এই সময়ের মধ্যেই কোম্পানির আমদানী-রপ্তানী শুল্কমুক্ত হয়ে গেছে। ফলে শুরু হয়ে গেছে তুলকালাম বাণিজ্য যা প্রায় লুঠের সামিল, তাই কয়েক বছরের মধ্যেই ১৬৮২ সালে শুধু বাংলা দেশে তাদের মূলধন দাঁড়ায়, ২,৩০০,০০০ পাউন্ড। আর এর পর এই অঞ্চলে জাহাজ চালানোর অসুবিধেগুলো এত তাড়াতাড়ি দূর করা হয় মাত্র চার বছরের মধ্যেই ১৬৮৬ সালে প্রায় ৭০ খানা কামানে সজ্জিত কোম্পানির যুদ্ধ জাহাজ এই নদী পথেই হুগলী আক্রমণ করে

ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসা ক্রমাগত ফুলে উঠতে লাগল। ফরাসির মাঝে মাঝে নানা ভাবে স্যাবোটেজ করবার চেষ্টা করেও তেমন ক্ষতি করতে পারেনি হঠাৎ একবার শোনা গেল ফরাসিদের জাহাজ আসছে সোরা কিনতে, মিহি মোটা সমস্ত সোরা উধাও করে ফেলল। এমনই ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

কোম্পানির শিক্ষিত পাইলটরা কোম্পানির জাহাজ ছাড়া অন্য কোন জাহাজে কাজ করতে পারত না। একবার শোনা গেল আন্তোনিও দ্য রোতা নামে এক পাইলট অন্য জাহাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে। এতে কোম্পানি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। তবে এটা তার প্রথম অপরাধ, তাই শুধু তিরস্কার করে তাকে রেহাই দেওয়া হয়। এটা ছিল ১৭০৭ সালের ১লা মার্চের কথা।

পণ্য জবরদখল, বাজেয়াপ্ত করা বা বে-আইনী আদায়ের জন্য, জাহাজ রক্ষার জন্য কোম্পানি ভাড়াটে সৈন্যের সংখ্যা বাড়াতে থাকে। ঠিক হয় এই কাজের জন্য একটি স্থায়ী সৈন্য বাহিনী তৈরি করা হবে। বাংলা দেশের বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ের নিরাপত্তার জন্য ২২০ জনের স্থায়ী বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৭১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। □

শুভাশিস মৈত্র

সবচেয়ে পুরাতন ইউনিয়ন

কলকাতা বন্দর এ দেশের ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে বলে দাবি করা হয়ে থাকে। জন্মদাতা এ দেশের কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। একজন পাদ্রি। নাম ডাঃ মোব্রিনো। ১৯২০ সালে তিনি কলকাতা পোর্টট্রাস্ট এ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। তখনও এ দেশে শ্রমিকদের জন্য পৃথক কোনো আইন হয়নি। মোব্রিনো বেশিদিন এই এ্যাসোসিয়েশানে থাকেন নি। কিন্তু অ্যাসোসিয়েশনটির মৃত্যু হয়নি। ১৯২৯ সালে এই অ্যাসোসিয়েশানটি রেজিস্টার্ড হয়। রেজিসট্রেশান নম্বর ছিল ১০। এখনও এই নম্বরই আছে। তবে এ্যাসোসিয়েশানের নাম বদল হয়েছে। নতুন নাম কলকাতা পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ান। এক থেকে নয় নম্বর অবধি যে ইউনিয়ানগুলি ছিল, সে গুলোর অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে। তাই বলতেই হবে যে পশ্চিমবঙ্গে এটিই সবচেয়ে পুরাতন ইউনিয়ান। খিদিরপুরে পাইপ রোডে এই ইউনিয়ানের বহুতল বাড়ি দেখে কিম্বা সে বাড়ির দোতলায় বর্তমান সেক্রেটারি পার্বতি দাসের খাস কামরা দেখলে মনেই হবে না এই ইউনিয়ানের এত বয়স হয়েছে।

১৯২৯-এ নাম ছিল ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট অ্যাসোসিয়েশন। তখনকার সভাপতি ব্যারিস্টার আই বি সেন। যুগ্ম সম্পাদক নৃপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য এই নৃপাল পরে এফিডেবিট করে নিজের নাম পালটে ফেললেন। নৃপাল হন নেপাল। এখনো পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়নের তিনিই সভাপতি। জন্মলগ্নে এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭০০। দশ বছর বাদে এই সংখ্যা ৫০০০ পেরিয়ে যায়। তারপর আরও প্রাক্তন সভাপতিদের তালিকায় অনেক রথী মহারথী আছেন। জে সি গুপ্ত, সৈয়দ নৌশের আলি, সুরেশ চন্দ্র মজুমদার (সাংবাদিক) অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, সোমনাথ লাহিড়ি, ইন্দ্রজিত গুপ্ত, অধীর ব্যানার্জী (সাংবাদিক)। প্রাক্তন সম্পাদকদের মধ্যে আছেন, মাখন চট্টোপাধ্যায়, জলি কাউল, প্রমুখ। বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে চিরকালই বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের মুসলমানদের প্রাধান্য। কিন্তু বন্দর শ্রমিকদের ইউনিয়ানে মুসলিম লীগের কোনো দিনই প্রভাব ছিল না। নৌশের আলি এবং অধ্যাপক হুমায়ন কবীরের নাম থেকেই বোঝা যাবে বন্দর শ্রমিকেরা জাতীয়তাবাদের পথেই ছিলেন। '৪২-এর আন্দোলনের পর এই ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাধান্য বেড়ে যায়। ১৯৪৪ সালে সোমনাথ লাহিড়ি হল সভাপতি। সম্পাদক নেপাল ভট্টাচার্যকে কলকাতার বাইরে অন্তরীন করায় সেক্রেটারির দায়িত্ব পান

শেড চুরি!

কলকাতা জেটি এবং সেখানকার শেডগুলো ভাঙা শুরু হয়েছে। প্রথম বলি ন নম্বর শেড। বন্দর কর্তৃপক্ষ ভাঙা গড়ার দায়িত্ব নিজেরা নেন না। এসবের দায়িত্ব দেওয়া হয় ঠিকাদারদের ওপর। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

তবে এই ব্যাপারে বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রচলিত আইন কানুনের কোন ধার ধারেন নি। এমন কি সি পি টির এফ এ অ্যান্ড সি. এ. ও (ফিনানশিয়াল অ্যাডভাইসার এবং চীফ অ্যাকাউন্টস অফিসার) এস ঘোষ বিস্তর লেখালেখি করে তীব্র আপত্তি জানালেও তাঁর কথায় কর্ণপাত করা হয় নি। উপরতলার কয়েকজন আমলা নিজেরাই সবকিছু করেছেন। সুবিধামত লোক ডেকে এনে তাদের শেড ভাঙার দায়িত্ব দিয়েছেন।

ভাগ্যবানেরা নামেই শেড ভাঙার ক্ষমতা পেয়েছেন। আসলে তাদের হাতে এসে গেছে সোনার খনি। মাত্র পয়তাল্লিশ লাখ টাকা দিয়ে তারা যে অমূল্য সম্পত্তির মালিক বনে গেছেন বাজারে তা কয়েক কোটি টাকায় বিকোলেও বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না। কারণ ১৯১০-১২ সালের ইংরেজ আমলে নির্মিত এই শেড গুলির প্রত্যেকটিতে আছে হাই গ্রেড স্ট্রাকচারাল স্টিম যা এখন ভারতবর্ষে পাওয়াই সম্ভব নয়।

ভাগ্যবানের এক কর্মচারী বললেন, বাকি শেডগুলো তাদের বাবুই পাবেন। পাবেনই তো, তাদের বাবুর যে সি. পি. টিতে অনেক বাবু আছেন। তাঁর বাড়া ভাতে ছাই দেবে কে।

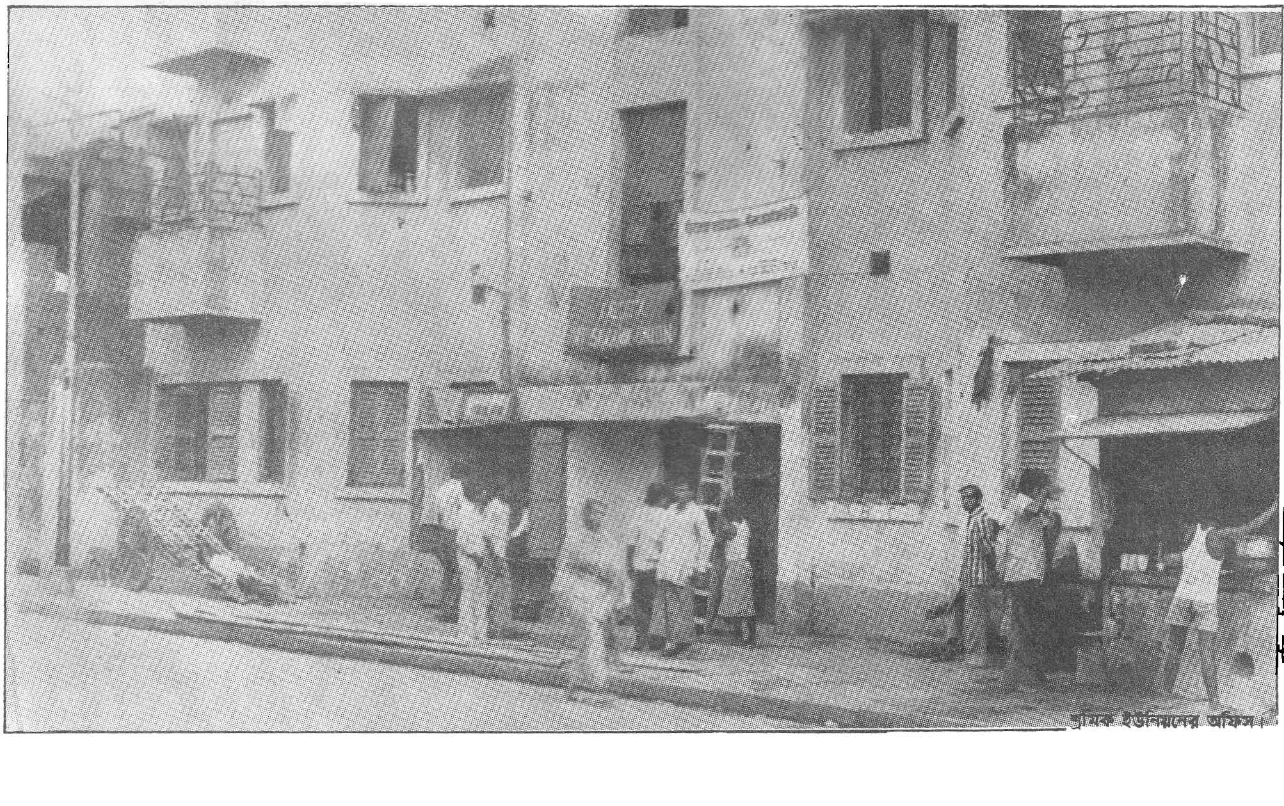

শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস।

ছবি : শিশির কর্মকার

রাধেশ্যাম ব্যানার্জী। তখন অফিস সেক্রেটারি মাখন চ্যাটার্জী। এঁরা তিনজনই তখন কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য। নেপাল বাবু বলশেভিক পার্টির নেতা। রুশ ভক্ত, কিন্তু ৪২ এর আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। তিনি চলে যাওয়ায় কম্যুনিস্টরা ফাঁকা মাঠ পেয়ে যান। কিন্তু বেশিদিন দুর্গ আগলে রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৫৬ সালে ক্যালকাটা পোর্টট্রাস্ট এমপ্লইজ এ্যাসোসিয়েশান আর কলকাতা পোর্ট মজদুর পঞ্চায়েত মিলে যায়। নতুন সংস্থার নাম হয় পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ান। সভাপতি অধীর ব্যানার্জী। কার্যকারী সভাপতি নেপাল ভট্টাচার্য। সম্পাদক মাখন চ্যাটার্জী। এঁরা কেউই কম্যুনিস্ট নন। অধীরবাবু কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী -- সি এস পি-র নেতা, '৪২-এর আন্দোলনে নেতৃত্বদিয়ে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি তখন সারা দেশে জনপ্রিয়। আগাস্ট বিপ্লব নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি এবং বলশেভিক পার্টির মধ্যে বনিবনা ছিল না। মাখন চ্যাটার্জি অনেক আগেই কম্যুনিস্ট পার্টি ছেড়ে সি এস পি হয়েছেন। সংযুক্তির পর যে নির্বাচন হয়, তাতে কম্যুনিস্ট ব্লকে একজন প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন। নাম প্রভাত মুখার্জী। পরে তিনিও কম্যুনিস্টদের ত্যাগ করেন।

পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ানে পাত্তা না পাওয়া ১৯৬০ সালে কম্যুনিস্টরা পাল্টা ইউনিয়ান গঠন করলেন। নাম হল ক্যালকাটা পোর্ট এ্যাণ্ড ডক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান। প্রথম সভাপতি ইন্দ্রজিত গুপ্ত। পরে এই ইউনিয়ান থেকে একটি অংশ বেরিয়ে যায়। এদের নাম হয় ক্যালকাটা পোর্ট এ্যাণ্ড শোর মজদুর ইউনিয়ান। সিটু পন্থি এই ইউনিয়ানের নেতা কে কে রায় গাঙ্গুলি। জনতা জমানায় নূর আহমদের নেতৃত্বে গঠিত হয় জনতা মজদুর পঞ্চায়েত। আরো পরে, ১৯৮৩তে ভারতীয় মজদুর সংঘের পতাকাতলে গঠিত হয় ক্যালকাটা পোর্ট ডক মজদুর সংঘ। এ ছাড়াও আরো ইউনিয়ান আছে যেমন ইউ টি ইউ সি। ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনারস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান।

মুসলিম লীগের হাতে ছিল জাহাজীদের একটি সংগঠন। নাম ছিল ন্যাশনাল ইউনিয়ান অফ পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়ীজ। সভাপতি ছিলেন শহীদ সোরাবর্দি। স্বাধীনতার পর এই ইউনিয়ানটি কংগ্রেসের সঙ্গে ভিড়ে যায়। এখন নাম হয়েছে, ন্যাশনাল ইউনিয়ান অফ ওয়াটার ফ্রন্টস ওয়ার্কার্স। নেতা জানকী মুখার্জী। একই নামে পাল্টা আরও একটি ইউনিয়ান গঠিত হয়েছে। তাঁরা শুধু শেষের দিকে ব্র্যাকেটের মধ্যেই শব্দটি জুড়ে দিয়েছেন। নেতার নাম নির্মল দাশগুপ্ত। এই দুটি ইউনিয়ানই আবার সুব্রত মুখার্জীকে নেতা হিসেবে মানে।

ভারতবর্ষে বন্দর শ্রমিকদের একগণ্ডা ফেডারেশান আছে। হিন্দ মজদুর সভার আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি, সি টু এবং সি টু অনুমোদিত। ভারতে মোট বন্দর শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় তিন লাখ। কলকাতা এবং হলদিয়ায় এদের সংখ্যা ৪০ হাজার। বছর দশের আগেও শুধুমাত্র কলকাতা বন্দরের শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার।

কলকাতা বন্দরে একজন শ্রমিকের সর্বনিম্ন বেতন ১০০০ টাকা। □

কাজু মুখার্জি

জাতীয় অপচয়

১৯৭৬ সালে দুজন সদস্যের যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তারা কলকাতা জেটিকে কনডেমড্ ঘোষণা করেন। তখন থেকেই হুগলি নদীর তীরবর্তী কলকাতা জেটির বিস্তীর্ণ এলাকাটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। কলকাতা বন্দরে আর কোনদিন বড় জাহাজ আসবার উপযোগী হবে না-একথা ঘোষণা করেই কমিটি কলকাতা জেটি বাতিল করার পরামর্শ দেন।

ঐ রিপোর্টের পর হলদিয়া বন্দরের গুরুত্ব বেড়ে যায়। এবং দ্বিতীয় সেতুটিকে কুড়িতলা সমান উঁচু করার আর কোন যৌক্তিকতাই থাকে না। তা সত্ত্বেও রাজ্যসরকার এবং পোর্ট কর্তৃপক্ষ একরকম গায়ের জোরেই কয়েকশো কোটি টাকা খরচা করে আকাশছোঁয়া দ্বিতীয় হুগলি সেতু নির্মাণের নাম করে অনর্থক কালহরণ করছেন। যে টাকায় দ্বিতীয় হুগলি সেতু নির্মিত হচ্ছে সে টাকায় বিবেকানন্দ সেতুর মত পঞ্চাশটি সেতু তৈরি করা যেত। কল্যাণীতে যে তৃতীয় সেতুটি তৈরি হচ্ছে তার অর্থচাহিদা দ্বিতীয় সেতুটির তুলনায় নামমাত্র। এসব জেনেও ওরা কেন আকাশছোঁয়া সেতু নির্মাণের জন্য জিদ ধরেছেন তা ওঁরাই জানেন। সেতুটির জন্য শুধু অর্থের শ্রাদ্ধই হবে না সেতুর উপর দিয়ে যাঁরাই যাবেন তাঁদেরই দু দশ মিনিট সময় বাড়তি খরচ হবে। একদিনে যে বাড়তি পেট্রোল অথবা ডিজেল খরচ হবে তার পরিমাণও কয়েক হাজার লিটার হবেই। দ্বিতীয় হুগলি সেতু জাতীয় অপচয়ের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে থাকবে।

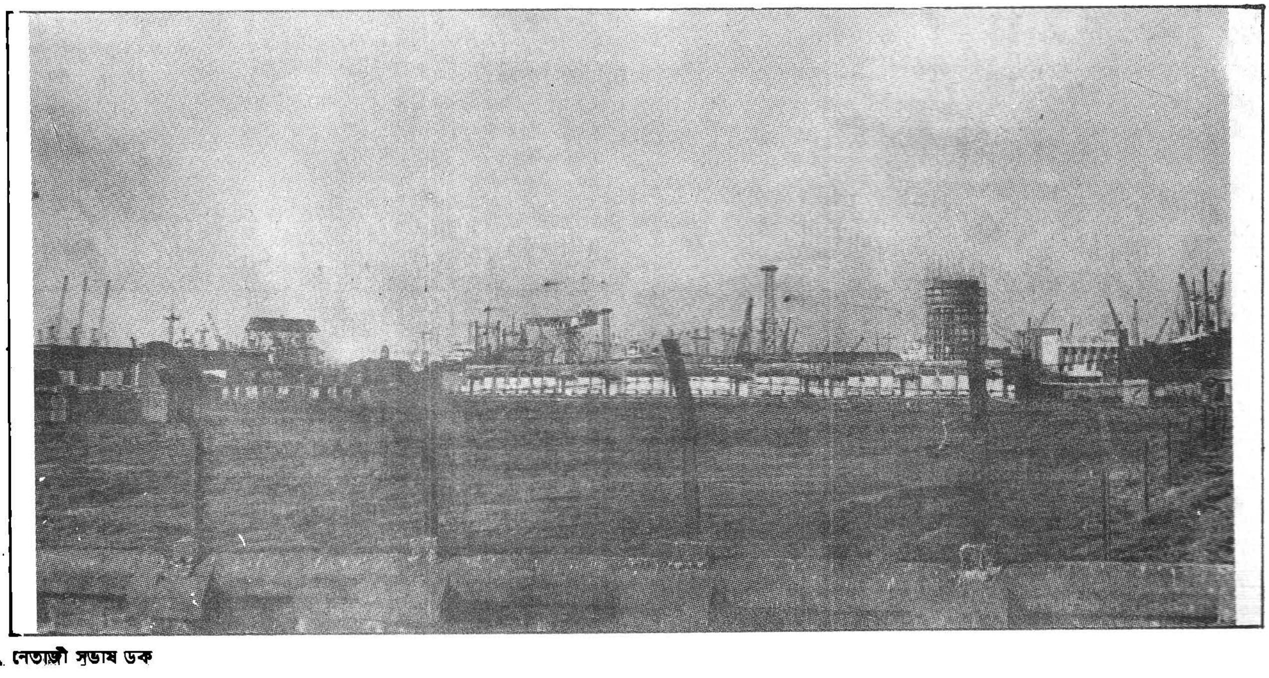

ছবি : শিশির কর্মকার

মাসিক মাহিনা হাজার টাকা এবং প্রত্যেক কেরাণীর ন্যূনতম মাসিক মাহিনা ১০৩৫ টাকা। সেখানে তখন ন্যূনতম মাসিক মাহিনা যথাক্রমে ১৮ টাকা ও ৪০ টাকা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কথায় প্রত্যেক শ্রমিক তাদের উপার্জনের টাকা প্রতি ছয় পয়সা করে ছেড়ে দিতে রাজি হয়, ফলে সেই ২০০০ জন কর্মী বরখাস্তের হাত থেকে বেঁচে যায়।

১৯৪০ সালে জানুয়ারি মাসে তিনি গোপনে রাত্রি ৩-৩০ মিনিটে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে এল্গিন রোডের বাড়িতে দেখা করেন। এর তিনদিন পর তাঁকে কলকাতা, ২৪-পরগনা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে তাঁকে যশোরের পৈত্রিক ভিটায় ফিরে যেতে হয়।

ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন সম্বন্ধে নেপাল বাবু জানান। এই আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে কারণ তাঁর মতে বর্তমান শ্রমিক নেতারা সকলেই পদলোভী ও অর্থলোভী।

৮৪ বছর বয়সের নেপালবাবু এখন ছেলে-মেয়ে, নাতি-পুতি নিয়ে ঘোর সংসারী হলেও ট্রেড ইউনিয়নকে ভুলে যেতে পারেন নি। তিনি এখনও পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি।□

সাক্ষাৎকার – শিখর কর্মকার

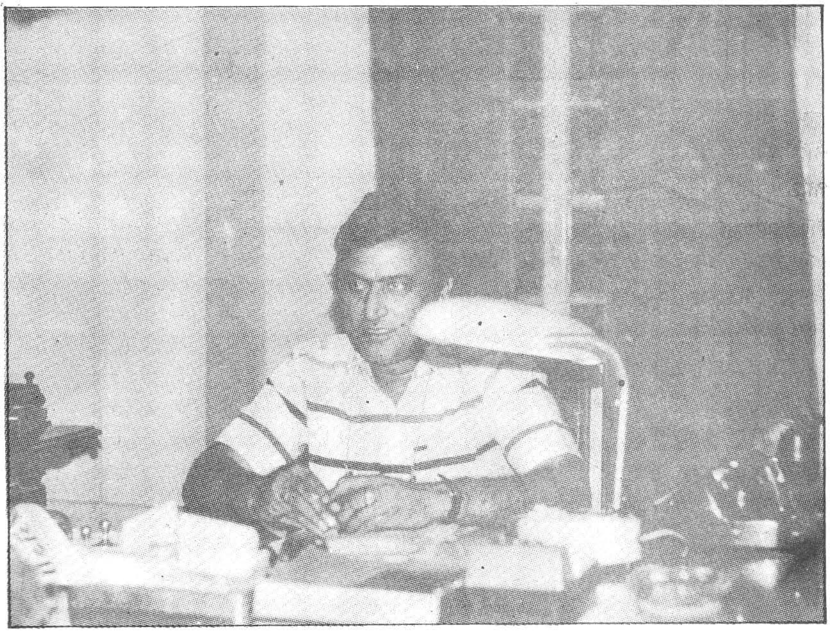

ডি. সি. (পোর্ট) হানডা।

ছবি : শিখর কর্মকার

হানডা মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছিলেন

অপকর্ম কখনই চাপা থাকে না। বন্দর-পুলিশের ডি সি রমেশ কুমার হানডাকে আচমকা অন্যত্র বদলি করায় বিভিন্ন মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তাঁকে এই বদলি করার পেছনে চোরচালানদারদের দুষ্টচক্রের হাত আছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের অভিযোগ। বদলির কলকাঠি নেড়েছেন বামফ্রন্টের এক প্রভাবশালী বিধায়ক। প্রয়াত ডি সি মেহতার সঙ্গে যার কোনদিন বনিবনা হয় নি। বর্তমান ডি সি রমেশ কুমারকেও যিনি বাগে আনতে পারেন নি সেই নেতার ফরওয়ার্ড মার্চের গুঁতোয় অবশেষে সরে যেতে হল শক্ত মানুষ বলে পরিচিত হানডা সাহেবকে। অথচ বন্দরের ডি সি হিসেবে রমেশ কুমার হানডা মাত্র দশ মাস কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কলকাতা পুলিশে এক জন ডেপুটি কমিশনার একই পদে সাধারণত সাড়ে তিন থেকে চার বছর পর্যন্ত থাকেন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে তা অমান্য করা হল। গত এপ্রিলে তিনি বন্দর ডি সির পদে বদলি হন। ঠিক দশ মাসের মাথায় তাঁকে বদলি করা হল সশস্ত্র পুলিশের সিনিয়র ডি সির পদে। অথচ এই বিভাগেরই পঞ্চম ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমিশনার হয়ে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবার সেই সশস্ত্র পুলিশেই কেনই বা তাঁকে বদলি করা হল তা বোঝা গেল না। অথচ তিনি নিজে বন্দরে আসতে চান নি। মেদিনীপুরের এস পি থাকার সময় কয়েক লাখ টাকার চোরাই তেল ধরে নাম কিনেছিলেন। কোন প্রলোভনই তাঁকে কাবু করতে পারে নি। এর আগে তিনি দার্জিলিঙের এস পি থাকার সময় শিলিগুড়ির চোরাচালানদারদের কোমর ভেঙে দিয়েছিলেন। নেপাল থেকে চোরাচালান তখন অনেক কমে যায়। চোরাই চক্রের গোপন চক্রান্তের ফলে অসময়ে তাঁকে যেখান থেকেও বদলি হতে হয়। মেদিনীপুর থেকে আসেন ডি সি ট্রাফিকের পদে। মাত্র কয়েকদিন ছিলেন সেখানে। বন্দরে আসার আগে তিনি ছিলেন ঐ পদেই। মেহতা-মোকতারের হত্যাকান্ডের পর পঞ্চম সশস্ত্র বাহিনীর ডি সি সুজিত সরকার মাস খানেকের জন্য ডি সি পোর্টের কাজ দেখাশুনা করেন। মি: হান্ডা পুরোপুরি দায়িত্ব নিয়ে গার্ডেনরিচ, ওয়াটগঞ্জ, খিদিরপুর এলাকার অবস্থা বাগে আনেন। দশ মাসে তিনি ফ্যান্সি মার্কেটে তল্লাসি চালিয়ে প্রায় এক কোটি টাকার বিদেশি মালপত্র উদ্ধার করে শুল্ক অফিসারদের হাতে তুলে দেন। গোপনে হানার পর হানা দিয়ে চোরা-চালানদারদের ঠান্ডা করে দিয়েছিলেন তিনি। ওরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছিল। বন্দরে ওয়াগন ভাঙা, জাহাজ থেকে মাল চুরির ঘটনা অনেক কমে গিয়েছিল এই কয়েক দিনে এই স্মাগলার চক্রের চাঁইরাই আলিমুদ্দিন স্ট্রিট আর লালবাজারের-বড়কর্তাদের কাছে নালিশ করেছিল। "তল্লাসির নামে গার্ডেনরিচে অত্যাচার চালানো হচ্ছে।" মি: হান্ডার জন্য এখানকার স্মাগলাররা পার্টি ফান্ডে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। ওদের বক্তব্য: হান্ডা আসার পর স্মাগলিংয়ের আয় অনেক কমে গেছে। তাই ফান্ডে প্রনামী দেবার মত টাকা নেই। এরাই এবার পার্টি ফান্ডে প্রণামী ঢেলে মি: হানডাকে বদলি করিয়েছে। পাঁচ লাখ টাকার খেলা হয়েছে। গিয়েছে দুটি পার্টির ফান্ডে। জ্যোতি বাবু নাকি হানডাকে এখনই সরাতে রাজি ছিলেন না কিন্তু পার্টির যে সেল আই পি এস অফিসারদের দেখভাল করে সেই সেলের চাপে জ্যোতিবাবুকে হান্ডার বদলির ব্যাপারে সায় দিতে হয়েছে। সশস্ত্র পুলিশে তাঁকে ফের বদলি করে না আনলে হয়তো ব্যাপারটা কারো চোখে লাগত না। কিন্তু যে ভাবে তড়িঘড়ি কাজ সারা হল তার ফলে ফাঁস হয়ে গেল আসল ব্যাপারটা।

আরও বিস্ময়ের ব্যাপার মি: হানডাকে

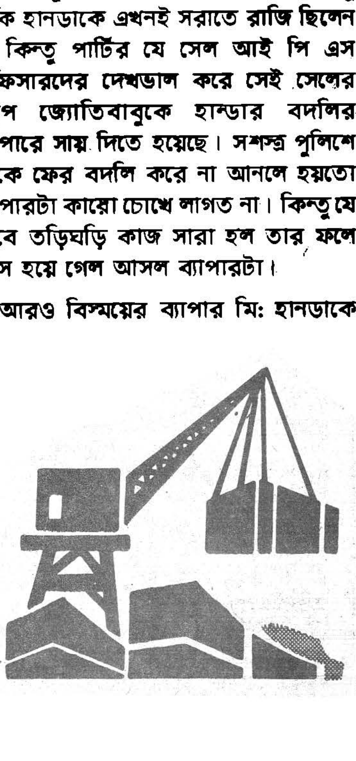

নেপাল ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

আজকের দুজন প্রবীণতম ট্রেড ইউনিয়ন নেতার মধ্যে একজন এস এস ডাঙ্গে, অন্যতম নেপাল ভট্টাচার্য। নেপালবাবু ১ বৈশাখ ৮৫ তে পদার্পণ করবেন। ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের মানুষটি এখনও সক্ষম।

১৯২০ সালে বর্তমান বাংলাদেশের দৌলতপুর কলেজে বি.এস.সি পড়ার সময় নেপালবাবু কংগ্রেসের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হন। সকলের অজান্তে বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান কলকাতায় পালিয়ে আসেন। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে "রমিস ম্যানসন"-এ ওঠেন। এই বাড়িতে থাকা কালিন তাঁকে দুবার জেলে যেতে হয়। পরে চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়িতে ওঠেন। চিত্তরঞ্জন নেপালবাবুর মায়ের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়ে তাঁকে নিয়ে পোর্ট ট্রাস্টের সদস্য হৃষিকেশ লাহার কাছে যান। হৃষিকেশ লাহার চেষ্টায় তিনি ১৯২২ জানুয়ারিতে পোর্টের উচ্চপদের চাকরি পান। কিন্তু সেই বৎসরের মার্চ মাসে গোয়েন্দা দফতর তাঁর বিরুদ্ধে ভগৎ সিং এর সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ আনে, ফলে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু সহকর্মীদের চেষ্টায় সেই বৎসরেই জুন মাসে সাধারণ কেরাণীর রূপে তিনি আবার চাকরিতে যোগ দেন।

তখন পোর্টের কর্মীদের পেনসন প্রথা চালু ছিল। এই প্রথা রদ করে যাতে সরকার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রথা চালু করেন সেই উদ্দেশ্যে তিনি সই সংগ্রহ শুরু করেন। এরপর থেকেই তিনি পোর্ট ট্রাস্টের কর্মীদের কাছের লোক হয়ে ওঠেন।

১৯২০ সালে ডঃ মরনো ক্যালকাটা ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন করেছিলেন। মধ্যবিত্তদের নিয়ে চলতে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হন। ১৯২২ সালে জুলাই-আগাস্ট মাসে নেপালবাবু এই সংগঠনকে আবার চাঙ্গা করে তোলেন, এবং ইন্দুভূষণ সেন মহাশয়কে সভাপতি করে নিজে যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে কাজ চালাতে থাকেন।

১৯২৬ সালে ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট চালু হওয়ার পর ১৯২৮ সালে তিনি রেল কর্মচারিদের দুটি সংস্থা ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি তালিকা রেজিস্ট্রি করান। এদের প্রত্যেকটির কোন না কোন পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তখনকার শ্রমিক আন্দোলনের সম্বন্ধে জানতে চাওয়ায় নেপালবাবু জানান, তৎকালিন পোর্টের চেয়্যারম্যান, Sir Thomas H. Elbonton Night তাঁকে লিখিত ভাবে জানান। — — — — —

"এখন থেকে প্রতি শুক্রবার বেলা তিনটের সময় আমি নিজে এবং আমার সেক্রেটারি দু'জনেই অফিসে অপেক্ষা করব এবং এই সময় আমি ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট কর্মচারিদের সমস্যা ও তা সমাধানের সূত্র নিয়ে আলোচনা করব। আমি আশা করব আপনি এবং আপনার সংগঠনের প্রতিনিধিরা (তিন থেকে পাঁচ জন) এই সময়ে উপস্থিত থাকবেন। আমি বিভাগীয় প্রধানদের জানাচ্ছি তাঁরা যেন প্রয়োজন অনুসারে আপনার সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং আপনাদের চিঠির উত্তর পনেরো দিনের মধ্যেই দেওয়া হয়।" — — — ফলে এক রকম তাঁদেরকে কোন আন্দোলনই করতে হয় নি।

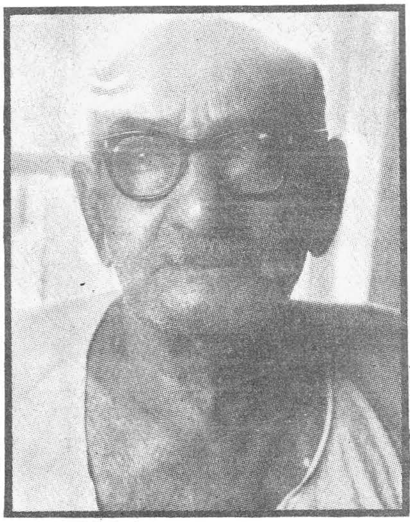

ছবি : শিখর কর্মকার

নেপাল ভট্টাচার্য

সেই সময় ট্রেড ইউনিয়নে নেতাদের মধ্যে দু ধরণের মানুষ ছিল। একদল শ্রমিকদের বিভিন্ন উন্নতির কথা চিন্তা করত আর অপরদলটি কার্লমার্কসের চিন্তাধারায় শ্রমিক বিপ্লবের কথা ভাবত। নেপালবাবু ছিলেন দ্বিতীয় দলের লোক, তিনি একসময় মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে নয়টি অভিযোগ আনেন এবং গান্ধীকে ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে তাঁর ডাকে পোর্টের ২২০০০ শ্রমিকের মধ্যে ২১০০০ শ্রমিক দেশবন্ধু পার্কে জমায়েত হয়। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ১৯৩১ সালে তৎকালিন কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা বন্দরকে আর সাহায্য দিতে না চাওয়ায় প্রায় ২০০০ কর্মীর চাকরি যাওয়ার উপক্রম হয়। যেখানে বর্তমানে প্রত্যেক সাধারণ শ্রমিকের ন্যূনতম

পোর্টল্যান্ড পার্কের বাদশাহিয়ানা

পোর্টল্যান্ড পার্ক কলকাতার বনেদি আলিপুর এলাকার সবচেয়ে অভিজাত অংশ। এখানে কলকাতা বন্দরের ছশ কাঠা জমি আছে যা দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। এই জমি ঘিরে আছে ডায়মন্ডহারবার রোড, রাজা সন্তোষ রোড আর আলিপুর রোড। এই জমিটুকুতে আছে মোট উনিশটি বাড়ি। দশটি দোতলা, নটি একতলা। বাড়ি তো না যেন স্বপনপুরী। গত জন্ম পূণ্যি করলে এমন বাড়ি কপালে জোটে। বাড়িগুলি উঠেছে মোট ষাট কাঠা জমির উপরে। বাকি পাচশো চল্লিশ কাঠা জমিতে শুধু ফুল আর ফুল। আর লতাপাতা। সবুজ ঘাস আর নানান রঙে রঙিন ফুল আর লতাপাতা দেখলে মানেই হবে না যে লক্ষ্মীছাড়া কলকাতায় আছি। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ এই বাড়িগুলি থেকে বছরে কুড়িয়ে বাড়িয়ে ভাড়া পান এক লক্ষ টাকা। কলকাতা বন্দর পুলিশের ডি. সি বন্দরের হারবার মাস্টার প্রভৃতি ভাগ্যবানদের মধ্যেও ভাগ্যবান। বন্দর দেবতার কৃপায় এদের ভাড়া দিতেই হয় না। এক লক্ষ টাকা ভাড়া পেলেও বাড়িগুলো দেখভালের জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষকে ফী বছর ব্যয় করতে হয় দশ লক্ষ টাকা।

স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক ভারতে অমন নবাবী ইন্তেজাম দিল্লীর মন পসন্দ নয়। তাঁরা বারবার বলেছেন, নবাবী ধাঁচের বাড়িগুলো ভেঙে কয়েকটা বহুতল বাড়ি তৈরি কর যেমন করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মেট্রোরেল, সেল প্রভৃতি। তাতে জমির সদব্যবহার হবে, শহরে গৃহসমস্যার কিছু লাঘব হবে আর কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের শূন্য ভান্ডারে কিঞ্চিৎ অর্থ আসবে।

কিন্তু পোর্টল্যান্ড পার্কের আমলারা যতবার ঐ প্রস্তাব এনেছে, নানা ভাবে বাগড়া দিয়েছেন। এই আমলাদের ক্ষমতার সীমা পরিসীমা নেই। বন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়ম হল বৃহত্তর কলকাতায় যাদের বাড়ি আছে এমন কি স্ত্রীর নামে বাড়ি থাকলেও পোর্ট ট্রাস্টের বাঙলো অথবা কোয়ার্টারে তাঁরা থাকতে পারবেন না। কিন্তু এই আমলাদের ক্ষেত্রে এ বিধি প্রযোজ্য নয়। এদের কারো সল্ট লেকে পেল্লায় পাড়ি আছে কারো বা গড়িয়াহাটে ঢাউস ফ্ল্যাট আছে। সে সব ভাড়া দিয়ে মাসে মাসে তিন চার হাজার টাকা অবধি আয় করেন। এসব না জানিয়েই দিব্যি নবাবী ধাঁচের কোন বাড়িতে থেকে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ন বজায় রাখছেন।

বদলির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বেশ কয়েকজন নিজের লোককেও বদলি করে দেওয়া হয়েছে। গার্ডেনরিচের ও সি অজিত ঘোষকে কয়েকদিন আগে তালতলায় বদলি করা হয়েছে। অথচ অজিত বাবু মাত্র মাস আটেক আগে গার্ডেনরিচের ও সি পদে যোগ দিয়েছিলেন। মি: হানডা বন্দর ডি সির কাজে ভার নেওয়ার পর অজিত বাবুর মত সৎ অফিসারকে তিনি ডেকে নিয়ে যান। তাঁর সুপারিশ মত তৎকালীন পুলিশ কমিশনার নিরুপম সোম অজিত বাবুকে গার্ডেনরিচে বদলি করেন। কিন্তু আবার তাঁকে আচমকা বদলি করা হল তালতলায়।

মি: হানডাকে কালাপানিতে পাঠালেও হাওড়ার পুলিশ সুপার সুলতান সিংকে কিন্তু দ্বীপান্তরে পাঠানো হয় নি। পৌর নির্বাচন, বিধানসভার উপনির্বাচন এবং হালফিল লোকসভা নির্বাচনে শাসকদলের জন্য তিনি যা করেছেন তাতে সি পি এম নেতারা বেজায় খুশি। রীতা বৈদ্যকে বৈদ্যুতিক শকে জখম করার ঘটনা আজ আর ওঁদের মনে নেই। সুলতানকে প্রথমে পাঠাবার কথা ছিল উত্তর বঙ্গের কোন একটি জেলার এস পি'র চেয়ারে। কিন্তু হাওড়ার কৃতজ্ঞ কমরেডরা তাঁকে দূরে ছাড়তে নারাজ। তাই দক্ষিণ কলকাতার ডেপুটি কমিশনার করে তাঁকে আনা হয়েছে। জ্যোতি বাবুর বাড়ি এবং আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের দেখভালের দায়িত্ব এখন সুলতান সিংয়ের। এর আগে তিনি পূব তল্লাটের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন বছর দুয়েক। তার পাশের জেলাতেই ফের তিনি বদলি হলেন। ঝামেলা কম। অভিজাত এলাকা। আগে কথা হয়েছিল সুলতানকে পাঠানো হবে উত্তর কলকাতায়। কিন্তু সোমেন মিত্রের ভয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে যাননি। দক্ষিণে আছেন সুব্রত। প্রিয়। ওরা ততটা মারাত্মক নয়। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতার মত অভিজাত এলাকায় সুলতানি মেজাজওয়ালা এই অফিসারকে কেন পাঠানো হল তা নিয়ে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

সামনেই কলকাতা পৌরসভার নির্বাচন তখন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কাজে লাগবে সুলতানকে। এই আশাতেই এবং বোঝাপড়াতেই তাঁকে আনা হয়েছে দক্ষিণ কলকাতায়। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার–আই পি এস এসোসিয়েশনের নেতাদের বদলির নামে হয়রানি করতে সি পি এম নেতারা সাহস পান নি এসোসিয়েশনের সভাপতি যুগ্ম কমিশনার বীরেন্দ্র কুমার সাহা তো নিজের আসনেই অধিষ্ঠিত রয়েছেন। সম্পাদক প্রসূন মুখার্জি উত্তর থেকে হাওড়ার এস পি হয়েছেন। যুগ্ম সম্পাদক সুজয় চক্রবর্তী মধ্য কলকাতা থেকে উত্তরে গিয়েছেন। □

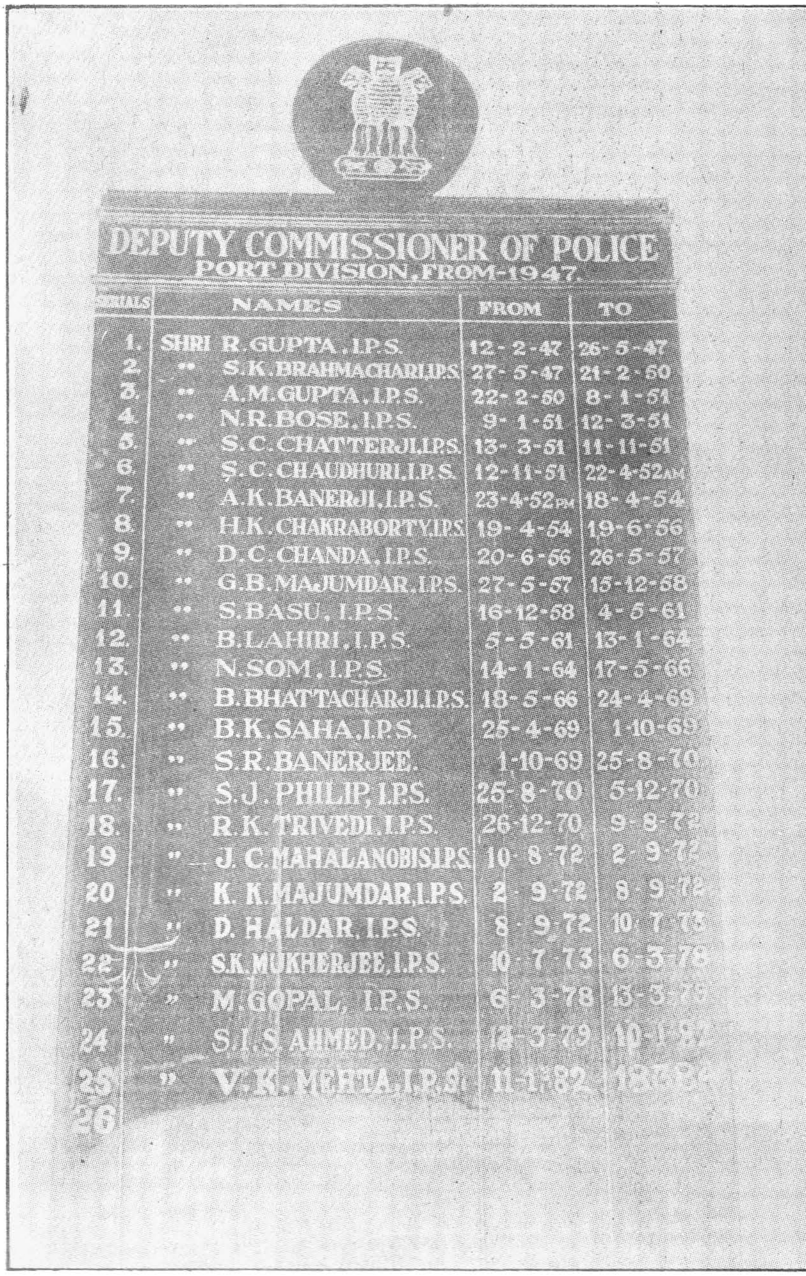

ছবি: শিশির কর্মকার

খিদিরপুরিয়া লালবাজারিয়া মাইকেল

৬৭ থিয়েটার রোড। তিনতলা ইমারত। এখানে অনেক নাটকীয় ঘটনা ঘটছে। একটির পর একটি।

কিছুদিন আগেও এখানে একটি ওয়ারকিং গার্লস হোস্টেল ছিল। দেখাশোনা করতেন মিস্ মেরিডিথ। খাঁটি বিলিতি মেমসাহেব। তাঁর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এক ডজন মহিলা চাকুরিয়া এই বাড়িতেই থাকতেন।

বাড়ির মালিকের নাম সুরেশ নেওটিয়া যার সম্পর্কে অনেক অনেক কথা বলেন। তবে তিনি যে প্রচন্ড প্রভাবশালী তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তাঁর মেয়ের শাদিতে আচ্ছা আচ্ছা পুলিশ অফিসারদের রাতভোর খানাপিনা করতে দেখা গেছে। এই বাড়ির দোতলায় নাগাল্যান্ড সরকারের গেস্ট-হাউস। সুরেশজির প্রভাব-প্রতিপত্তির একটি উজ্জ্বল প্রতীক।

এক ছোকরা তার নাম নাকি চৌধুরী, তাকে কারা যেন ওই বাড়ি থেকে ওয়ারকিং গার্লসদের বিদেয় করার ঠিকে দিয়েছিলেন। ১২টি মেয়ের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল লাখ টাকা। ঠিকে পেয়েই চৌধুরী সন্ধ্যার পর বাড়িটির সামনে ১৪৪ ধারা জারি করে দেয়। মেয়েদের ডেকে বলে দেয় সন্ধ্যা সাতটার পর বাইরের কেউ যেন এই বাড়িতে না ঢোকে।

একদা এক মহিলা বোর্ডারের বেপরোয়া এক পুরুষ বন্ধু সন্ধ্যা সাতটার পরই মেয়েদের হোস্টেলে প্রবেশের জন্য জিদ ধরলেন। চৌধুরী তখন ওখানেই বিয়ার খেতে খেতে ডিউটি দিচ্ছিল দলবল নিয়ে। বাইরের পুরুষটিকে ভিতরে যেতে বাধা দিয়ে বলেছিল, ওদিকে যেয়োনা। ১৪৪ ধারা আছে। অতগুলো লোক দেখেও পুরুষটি ভয় পাননি। বলেছিলেন, ১৪৪ ধারা? কই দেখি? চৌধুরী বলেছিল, দেখবে? তার পরই একাট বিয়ারের বোতল বেপরওয়া প্রেমিকের গায়ে ভেঙেগ ফেলে।

তখন পূর্ব কলকাতার ডি.সি রমেশ চন্দ্র হান্ডা। তিনি সপারিষদ চৌধুরীকে হাজতে পুরে ফেলেন।

হান্ডার পর এসেছিলেন সুলতান সিং। মামলা চলতেই থাকে, কিন্তু সালাউদ্দিনের কপাল ফিরে যায়। চৌধুরীর সুলতানি দাপটে একডজন ওয়ারকিং গার্লস আর কোনো পথ পাননি। মুখ বুঁজে অপমান সয়ে তাঁরা বিদায় নেন। সেই থেকে বাড়িটি পুলিশের উপরওয়ালাদের ভোগে আসছে। প্রায়ই পার্টি হয়। খানাপিনার আসর বসে। পূর্ব কলকাতার ডি.সি বিষ্ণু সহায় পুলিশ পদক পেলে তাঁর রিসেপশান উপলক্ষে একটা সলিড-লিকুইড রিসেপশানের ব্যবস্থা হয়। লালবাজার থেকে মাথা না এলেও একটা কাঁধ এবং কয়েকটা ভুঁড়ি এসেছিল। হাজির ছিল কয়েকজন ডাকসাইটে চোরাচালানিও।

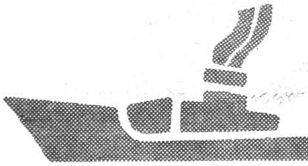

যেদিন এই মিডনাইট রিসেপশান হয়, সেদিনটা ছিল রবিবার। তার ঠিক আগের দিন কলকাতা বন্দরের ডি.সি রমেশ-চন্দ্র হান্ডা বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে খিদিরপুরের ফ্যান্সি মার্কেট ও ফাইভ স্টার মার্কেটে হানা দিয়েছিলেন। অতর্কিত হানায় লাখ টাকার চোরাচালানি মাল আটক পড়ে। নৈশ আপায়ন আসরে একজন খিদিরপুরিয়া চোরাচালানি লালবাজারিয়াদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আপনাদের জন্য এতো করছি, তবু আপনারা এভাবে হানা দিচ্ছেন কেন?

লালবাজারের জনৈক পদস্থ অফিসার বললেন, খিদিরপুরিয়ার ওই মন্তব্য যখন শুনলাম, তখনই বুঝেছিলাম রমেশ ভাইয়ার দিন ফুরিয়ে এসেছে। □

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হান্ডার গোপন চিঠি

চার্জ বুঝিয়ে দেওয়ার আগে, বন্দর এলাকার বিদায়ী ডি.সি রমেশচন্দ্র হান্ডা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি গোপন চিঠি দিয়েছেন। এই চিঠি আমরা দেখিনি। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা যা জেনেছি, তাতে মনে হয় চিঠির এইরকম হবে :

১৯৮৪র ১৮ এপ্রিল জুনিয়ার অফিসারদের জন্য সংরক্ষিত ডি.সি পোর্ট পদে আমি যোগ দিই। এর ঠিক এক মাস আগে ডি.সি পোর্ট বিনোদকুমার মেহতা এবং তাঁর দেহরক্ষী মোক্তার আলি খুন হন।

বন্দর এলাকার বৈশিষ্টই হল চুরি, ডাকাতি, চোরাচালানি, জোর-জুলুম, খুন খারাপি। চোরাচালান সমাজ বিরোধীদের উৎসাহের উৎস। এদের প্রধান আড্ডা দুটি মার্কেট—ফাইভ স্টার এবং ফ্যান্সি মার্কেট। কাস্টমসের অফিসারদের সঙ্গে আমি এখানে বার-বার হানা দিয়েছি। লাখ-লাখ টাকার চোরাচালানি পণ্য বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ম্যাফিয়া গ্যাংগুলোকে আমি মাথা তুলতে দিইনি।

ওই দুষ্ট চক্র সবসময়েই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে চায়। এই পথেই মেহতাকে খুন করা হয়েছিল শুধু হিন্দু-মুসলমান নয়। মুসলমানদের সুন্নি সম্প্রদায়ের দুই শাখার মধ্যে সংঘর্ষ বাধাতেও ওরা তৎপর হয়েছিল। মহরমের মিছিল নিয়ে হুজ্জত বাধাতেও চেষ্টা হয়। আমি সবসময়েই সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যাই এবং অবস্থা আয়ত্তে আনি। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গানধী নিহত হওয়ার পর নতুন করে চেষ্টা হয় বন্দরে অশান্তির সৃষ্টি করার। আমি তা হতে দিইনি।

বন্দরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেও দারজিলিং এবং মেদনিপুরের মতন অসময়েই আমাকে বদলি করা হয়েছে। ম্যাফিয়া গ্যাং এর বিরুদ্ধে গিয়েছি বলেই বার বার আমার এই হাল হচ্ছে। বন্দরে মেহতা-মোক্তার আলির খুনের জন্য যারা দায়ী, তারাই আমাকে বন্দর থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কলকাঠি নেড়েছে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, ম্যাফিয়া গ্যাংএর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। আমি তাই করেছি। কেউ বলেননি যে আমি ভুল বা অন্যায় করেছি। এখন বুঝতে পারছি না, মেহতা-হত্যার জন্য আমরা শোক করেছি কেন? □

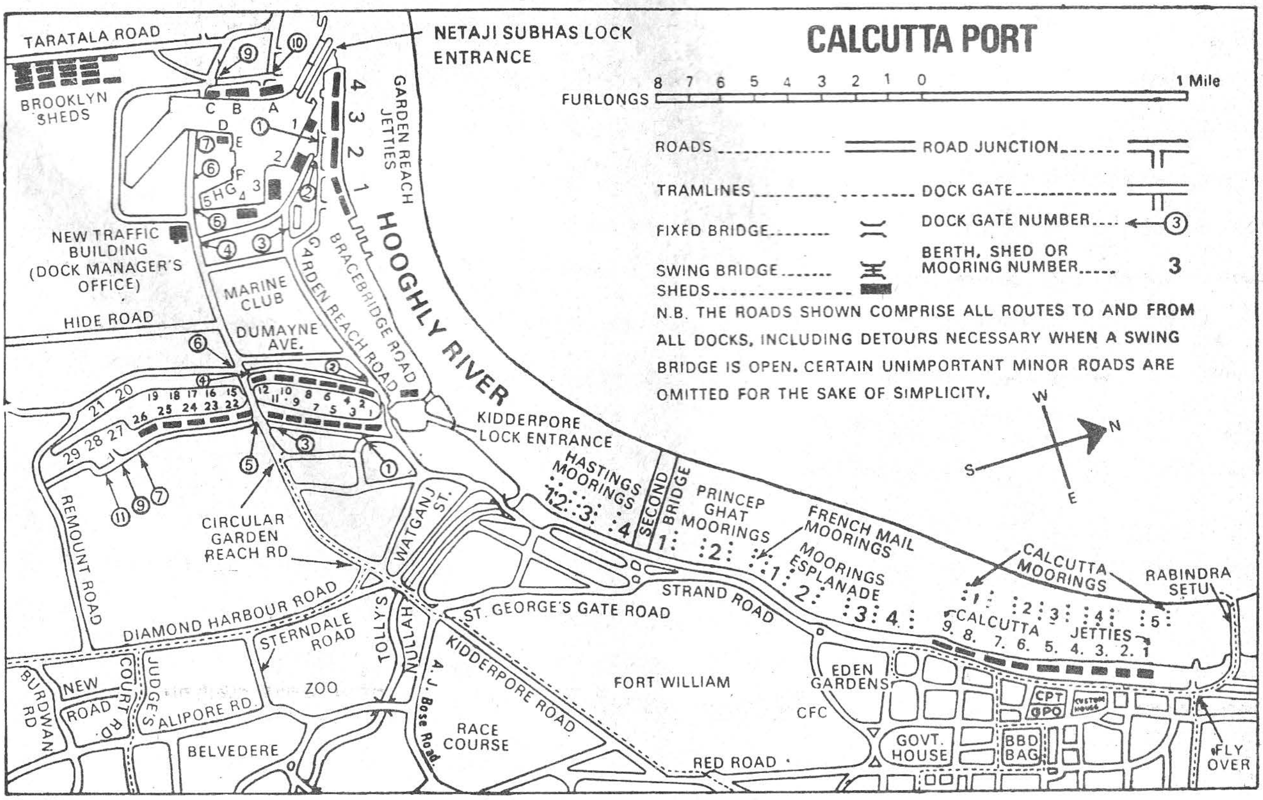

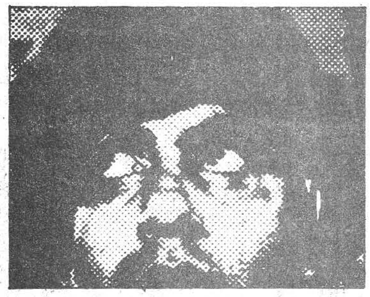

চোরা চালানের স্বর্গরাজ্য

ছবি : শিশির কর্মকার

ফ্যান্সী মার্কেট।

ফাইভ-স্টার, ফ্যান্সি মার্কেট, সুপার হিন্দ, রয়্যাল, এয়ার কন্ডিশান মার্কেট। খিদিরপুর মানেই মার্কেট আর মার্কেট। এ-মার্কেট সে-মার্কেট নয়। কলেজ স্ট্রীট অথবা কড়েয়ার মতন বিধবা মার্কেট নয়। এ মার্কেটের আলাদা জাত আছে। নিষিদ্ধ পণ্যের প্রকাশ্য বিকিকিনি এদের বৈশিষ্ট্য।

কলকাতা বন্দরের বৈশিষ্ট্য হল এই পঞ্চ-পান্ডব। পাঁচটি মার্কেট এই নামেই পরিচিত। এই মার্কেটগুলিকে যারা জিইয়ে রেখেছে, তাদের অধ্যাবসায়ের তুলনা হয়না। মাঝ গঙ্গায় মধ্যরাত্রে জাহাজ খালাস করা, রাতের অন্ধকারে নৌকা করে সেই চোরাই পণ্য ডাঙ্গায় নিয়ে আসা। তারপর জল-স্থল অথবা আকাশ পথে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে দেওয়া। এই ব্যবসায় যারা ক্যাপটেন, তাদের কাজের অন্ত নেই। রাত্রে ঘুমলে চলে না। কলকাতা বন্দর এবং তার পুলিশ ও কাস্টমস এর মাথা থেকে পা অবধি সকলকে অস্টপ্রহর খুশি রাখা, রাজনীতির পান্ডা এবং মহল্লার মস্তান ও উঠতি মস্তানদের দলে রাখা সহজ কাজ নয়। এই ক্যাপটেনদের বাহাদুরি সবকিছুতেই। মার্কেটগুলোর ইতিহাসের দিকে তাকালেই সে কথা বোঝা যাবে।

২৬ নম্বর সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড-এ দু বিঘে জমির উপর জনা চল্লিশেক ভাড়াটে ছিল। হঠাৎ একদিন জানা গেল, এক সালাউদ্দিন এই জমির মালিক। তার পক্ষে এক মস্তান বাহিনী ওখানকার দোকানিদের বলতে লাগলো, তোরা উঠে যা। বড় মার্কেট হবে, সেখানে দোকানঘর পাবি। কয়েকজন পেয়েছেও। যেমন এক নম্বর স্টলে মুর্তজা এবং ইসলাম-দুই ভাই। দু নম্বর স্টলে ভোলা মিস্ত্রি। বাকিরা সব হারিয়ে গেছে। গড়ে উঠেছে বিরাট পাঁচতলা ফাইভস্টার মার্কেট। কী ভাবে আপদ বিদেয় হয়েছে পুলিশের তা জানবার কথা। কিন্তু গত কয়েক বছরে অমন অনেককিছু হয়েছে যাতে পুলিশকে কিছু করতে দেখা যায়নি। ফাইভ স্টার মার্কেটের বাড়ি প্ল্যান অনুযায়ী হয়নি। কিন্তু এ সব বড় ব্যাপারে কলকাতা করপোরেশান অনেকদিনই অন্ধ।

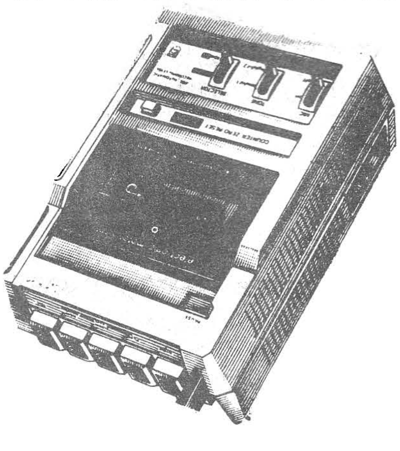

ফাইভ স্টার মার্কেটের পাঁচ সাতটি স্টলে পাবেন না দুনিয়ায় এমন কোনো চীজ নেই। ফ্রান্সের খুশবু, জাপানের ওয়ান-ইন-ফাইভ, মার্কিন মুলুকের ড্রেস মেটিরিয়াল। যা চাই, তাই পাবেন। ব্লু ফিল্মের ক্যাসেট প্রজেকটর এবং সকল নিষিদ্ধ পণ্য। কাস্টমস এবং বন্দর পুলিশ বার-বার এই মার্কেটে হানা

দিয়েছে। হানা মানেই কিছু পণ্য বজেয়াপ্ত করা। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়। পুলিশ চলে গেলে আবার যে কে সেই। কোনো অফিসার বাড়াবাড়ি করলে, তার মুণ্ডু থাকে না। কপাল ভালো হলে নিরাপদে অন্য কোথাও বদলি হন।

ফাইভস্টারের সাফল্য ২৮ নম্বর সারকুলার গার্ডেন রীচের ৭৪টি ভাড়াটিয়া পরিবারের জীবনে বিপদ ডেকে এনেছে। এখানে জমির পরিমাণ দু বিঘে দু কাঠা চার ছটাক। হাজার তিনেক মানুষকে এই জমি আশ্রয় দিয়েছে। এখন ফাইভ স্টার মার্কেট এই জমিটাকে গিলে খেতে চাইছে। তাহলে এর আয়তন এবং পরিধি আরো বৃদ্ধি পাবে। গরীব মানুষগুলোকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এতো জানা কথাই।

ফ্যান্সি মার্কেট ঠিক ফাইভ স্টারের পাশেই। লাগোয়া বহুতল বাড়ি। ঠিকানা, ২৫ সার্কুলার গার্ডেন রোড। মালিক মহেন্দ্র সিং থাকেন মনসা তলায়। বড়বাজারে কাপড়ের দোকান ছিল। হয়ত আরো কিছু ছিল নইলে খিদিরপুরের মত এলাকায়, এক বিঘে জমির উপর এতবড় মার্কেট ভাবাই যায় না। এই বাড়ির সামনে করপোরেশানের একটি শৌচাগার ছিল। অনেকদিন হল হারিয়ে গেছে। কী ভাবে, কবে, তা হয়ত দেড়শত স্টল হোল্ডারদের কেউই বলতে পারবেন না। মালিক মহেন্দ্র সিংকে কেউ ধরতে পারবেন না। ফ্যান্সি মার্কেটে তাঁর দিশি কোল্ড ড্রিংক আর দিশি কাপড়ের দোকানের স্টল আছে। চারিপাশে চোরাচালানের সাগরের মধ্যে তিনি একটি দ্বীপ হতে পারেন কি?

সুপার হিন্দ মার্কেট (আহা কি নাম রে!) এখনো তৈরি হচ্ছে। ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীটে আরো কিছু দূরে রয়েল মার্কেট। আদি চোরাচালানি মার্কেটটি তার বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। এয়ারকন্ডিশনা মার্কেটিং মালিককে সকলে প্রিন্স ইমাম বলেই জানেন। তিনিও সুবিধা করতে পারছেন না। এখন রমরমা কারবার সালাউদ্দিন আর মহেন্দ্র সিং-এর। □

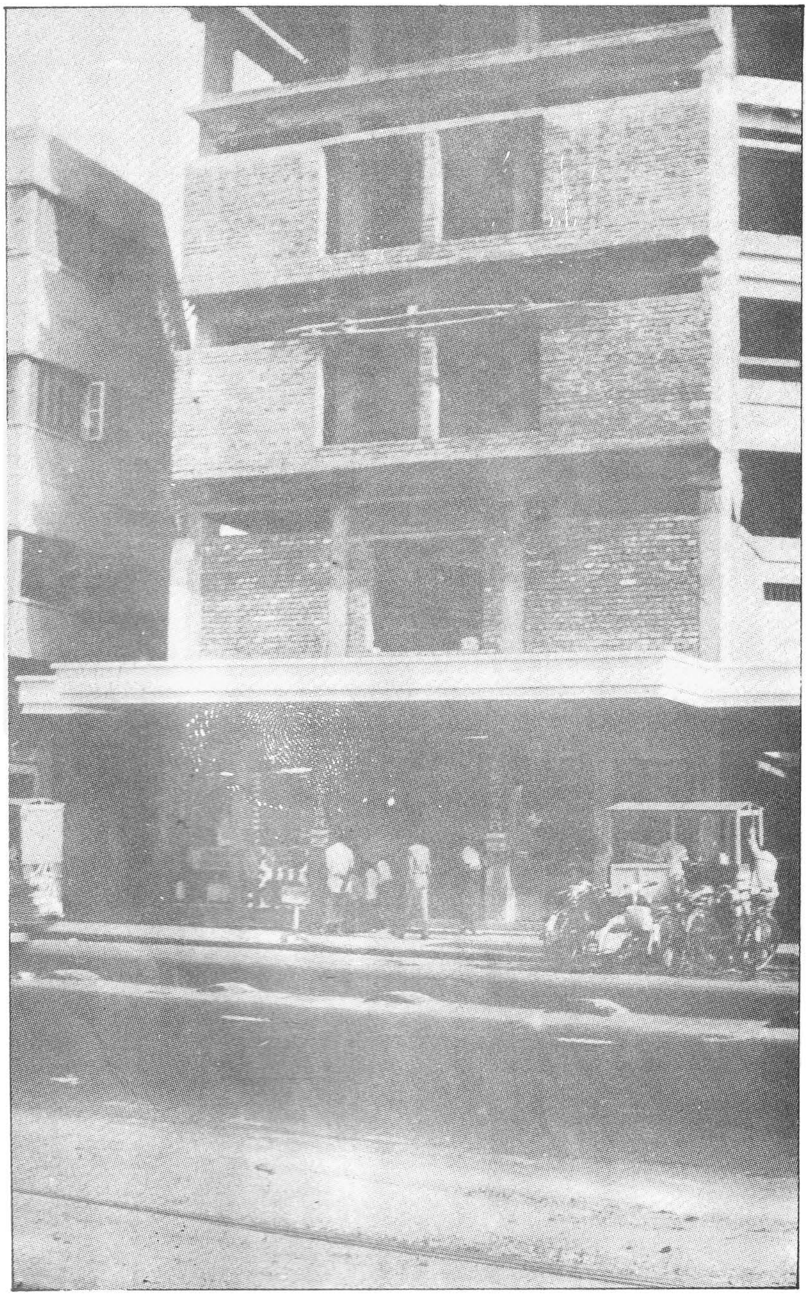

ফাইভ স্টার মার্কেট।

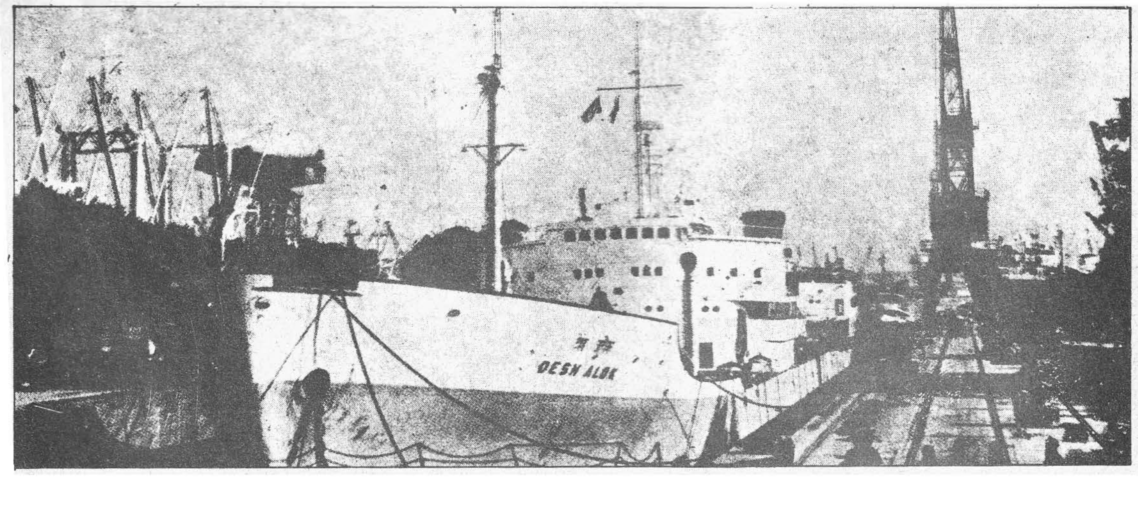

জাহাজ ব্যবসায়ের সংকট কাটিয়ে ওঠা খুব শক্ত

সমগ্র বিশ্বজোড়া এক অভাবনীয় সংকটে মুখ থুবড়ে পড়েছিল জাহাজ শিল্প গোটা ১৯৮৪ সাল। সারা বিশ্বজুড়েই তাবড় তাবড় জাহাজ কোম্পানি তাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। টিম-টিম করে যে কটি এখনও কাজ চালু রেখেছে তাদের অবস্থাও বেশ শোচনীয়।

এই অবস্থা কিন্তু এজন্য নয় যে খুব কম পরিমাণ পরিবহনযোগ্য মালের বিপরীতে আছে ব্যাপক সংখ্যক জাহাজের প্রতিযোগীতা। বরং বলা যায় এমনটা হয়েছে জাহাজে অকল্পনীয় রকমের আধুনিকীকরণ ঘটে যাওয়ার ফলে। এরই ফলে সম্ভব হয় অনেক কম সংখ্যক জাহাজের অনেক কম সময়ে অনেক বেশি দূরত্ব অতিক্রম করা একই সংগে জাহাজগুলোর মাল পরিবহনের ক্ষমতাও অনেক বেড়েছে। জাহাজ ব্যবসা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে মূলধন নির্ভর একটি বাণিজ্য।

ভারত সরকারের তরফ থেকে এই অবস্থাটা বদলাবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা নেওয়া হয়েছে। যদিও জাহাজ শিল্পের মালিকদের তরফ থেকে সরকারকে কোন দিনই অনুরোধ জানান হয়নি কোন রকমের সাহায্যের জন্য। শুধু তাদের তরফ থেকে ক্রমাগত সরকারের কাছে একটি অনুরোধ বার বার করা হয়েছে। তা হল, জাহাজ শিল্পের আওতার বাইরে যে সমস্ত এলাকাগুলো আছে, সরকার যেন সে সব জায়গার প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধন করেন, যেমন কলকাতা বন্দর।

পোর্টের সুযোগ সুবিধে বাড়ান ছাড়াও, এখানে আধুনিক বন্দরের সমস্ত ব্যবস্থা রাখা উচিত যাতে জাহাজগুলো খুব তাড়াতাড়ি তাদের কাজ সেরে বন্দর ছেড়ে চলে যেতে পারে। এছাড়া পরিবহনের জন্য সরকারের তরফ থেকে মাশুলের ব্যাপারটাও তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ এর ফলে অযথা ঝামেলা, অকারণ দেরি, অনেকদিন ধরে টাকা আটকে থাকা, এসব ঘটনা ঘটে থাকে।

নানান কারণেই জাহাজ ব্যবসায় আছে এক ভয়ংকর রকমের ওঠা-নামা। এরই ফলে জাহাজের দামও ব্যাপক ভাবে কম বেশি হয়ে থাকে। এই সমস্ত কারণে সরকারের তরফে গাফিলতির জন্য জাহাজ গুলোর যে সময় নষ্ট হয়ে যায়, এর ফলেই কোম্পানিগুলো বাজারের দামের ওঠা-নামার সুযোগ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। এটা ব্যবসায়ের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

এছাড়া আরো একটি সাংঘাতিক সমস্যা হল, জাহাজ তৈরিতে যদিও সরকার নানাভাবে সাহায্য করছেন, কিন্তু একটি কোম্পানি যখন জাহাজের জন্যে অর্ডার দিচ্ছে ১৯৭৬ সালে, সেই কোম্পানিটি তা পাচ্ছে ১৯৭৬ সালের চেয়েও পিছিয়ে থাকা যন্ত্রপাতিতে তৈরি।

আজকাল বাংলাদেশ, শ্রীলংকার মত ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোতে আইন করে বিদেশী কোম্পানির জাহাজের উপর চাপানো হয়েছে হাজার রকম বিধি-নিষেধ।

আইন করে বন্ধ করা হয়েছে বিদেশী কোম্পানির মাল পরিবহন। সেক্ষেত্রে ভারতের বন্দরগুলো রাখা হয়েছে অবারিত দ্বার। এ বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ভাবা প্রয়োজন। □

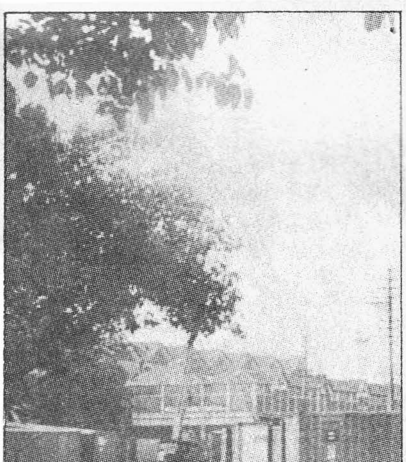

অর্থশ্রাদ্ধ এই ভাবেই হয়

কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের আরেকটি পরিচয় আছে। এরাই এ রাজ্যে সব থেকে বড় জমিদার। সি. পি. টি.র জমিদারি ছড়িয়ে আছে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। কলকাতা, হাওড়া, ফলতা, স্বরূপগঞ্জ, বজবজ, কাঁথি—আরও অনেক জায়গায়। এত জমির হিসেব রাখা একটা কঠিন ব্যাপার। তাবৎকাল এসব কাজ করতেন সি পি টির ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট। কাজ বলতে জমির জরিপ এবং মূল্য নির্ধারণ–ভ্যালুয়েশন। এই মহাকর্ম যজ্ঞে ওভারটাইমই লেগে যেত দশ বারো হাজার টাকা।

হঠাৎই সি. পি. টির ডেপুটি চেয়ারম্যানের খেয়াল হল এক মাসের মধ্যে সি পি টির সকল জমি নতুন করে সার্ভে এবং ভ্যালুয়েশন ঠিক করতে হবে। ডাক পড়ল ঠিকাদারদের। কলকাতার নামি দামি সংস্থাগুলো এক বাক্যে জানিয়ে দিলেন কলকাতায় এক মাসের মধ্যে সার্ভে হলেও হতে পারে বাইরের কাজ এই সময়ের মধ্যে কিছুতেই সম্ভব না।

সকলকে অবাক করে কাজটি দেওয়া হলো হীরক সেন (এইচ. কে. সেন এ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস) এবং এ কে দে (এ কে দে এ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস)কে, হীরক পেলেন চৌদ্দ আনা কাজ। তার ভাগে পড়ল কলকাতা ও হাওড়া। বাকী দু আনার বরাত পেলেন যে এ কে দে তাঁর ভাগে পড়ল বজবজ। বাকী এলাকার জন্য কাউকেই কিছু করতে বলা হল না। এই কাজের জন্য মূল্য ধরা হলে বারো লাখ টাকা।

ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা একযোগ লিখিত আবেদন জানালেন আমাদের ওভারটাইম বাবদ কুড়ি হাজার টাকা বরাদ্দ করুন। ঐ কাজ আমরা এক মাসের মধ্যেই শেষ করে দেব। আবেদন গেল দিল্লীতেও, কেউ ওদের কথায় কর্ণপাত করলেন না।

ভাগ্যবান ঠিকাদারেরা যথাসময়ে কাজ শুরু করে দিলেন। পরিবর্তিত আদেশে ওদের তিন মাসের মধ্যে কাজ শেষ করতে বলা হয়ে ছিল। ওঁরা নিলেন পুরো তিনটি বছর।

বাকি এলাকার জরিপ এখনও হয় নি। সি. পি. টির কাজ এই ভাবেই হয়। অর্থের শ্রাদ্ধ হয় এইভাবেই। □

কলকাতা বন্দর ঃ হতাশার বিরুদ্ধে

অনিকেত হালদার

মাত্র বছর চারেক আগেও কলকাতা বন্দরের অবস্থা যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাতে এই বন্দরের উন্নতিকামী কোনো কৌতূহলী ব্যক্তিকে কিছুটা হতাশই হয়ে পড়তে হত। তখন কলকাতা বন্দর সম্বন্ধে একদিকে তোলা হচ্ছে 'গেল গেল' রব, অপরদিকে, কলকাতা বন্দরের দুরবস্থাকে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ক বিতর্কের একটি অন্যতম প্রধান ইস্যু করে তোলা হচ্ছে, এবং একই আলোচনার সূত্র ধরে তখন কলকাতা বন্দরের প্রধান অঞ্চল থেকে হলদিয়া ডক্ কমপ্লেক্সের বিচ্ছিন্নকরণ, ফরাক্কা থেকে হুগলীতে জল সরবরাহের মাত্রা কী হওয়া উচিত প্রভৃতি পুরানো ইস্যুগুলিও আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে। এ সবেরই মূলে ছিল কলকাতা বন্দরের কর্মতৎপরতার এক হতাশাব্যঞ্জক অবনতি।

তুলনায়, কলকাতা বন্দরের আজকের ছবিটা ঠিক উল্টো। হতাশার জায়গা নিয়েছে আশা ও উদ্দীপনার ছবি। কর্মবিমুখতার জায়গায় এসেছে আরো বেশি কর্মতৎপরতা। শ্রমিক অসন্তোষ অনেক কম। একই সঙ্গে হুগলীর নাব্যতা হ্রাসের মত গুরুতর সমস্যাগুলিও এখন ক্রমশ কমতির দিকে। সব মিলিয়ে, অবস্থা এখন আগের তুলনায় অনেকটা ভালো।

এ-প্রসঙ্গে বছর চারেক আগেকার দুঃসময়টির কিছুটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে। সংক্ষেপে বললে, এই দুরবস্থার মূল লক্ষণগুলি ছিল নিম্নরূপ:

(১) ভাগীরথী হুগলীর নাব্যতা হ্রাস ও সে কারণে কলকাতা বন্দরের ব্যবহার যোগ্যতার অবনতি।

(২) জাহাজ শিল্পের স্বদেশী ও বিদেশী মনপলিস্টিক্ কম্পিটিশনে কলকাতা বন্দর সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি। এবং (৩) শ্রমিক অসন্তোষ।

অবশ্যই, এই সমস্যাগুলি একে অপরের সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্কিত। একই সঙ্গে এইগুলির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এক অবনতিশীল বন্দরের অন্যান্য অনেক আনুষঙ্গিক সমস্যা--যেমন, বিভিন্ন 'restrictive practices' (চুরি, ছিনতাই, কালোবাজারি ইত্যাদি)। তাছাড়া কিছু টাইম ও পারস্পেকটিভ ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত সমস্যার কথাও বলা যায়।

পরের বেলায় দাঁত কপাটি

কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তরুণ দত্ত বন্দরে শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। তাঁর জমানায় ইতিমধ্যেই শ-দেড়েক কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কেউ বরখাস্ত হয়েছেন, কারো বা কপালে জুটেছে সাসপেনশন। বাকিরা পেয়েছেন, চার্জ শিট, বেশ কয়েকজনকে পোর্ট ট্রাস্টের কোয়ার্টার থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

শেষোক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা রিটায়ার করার পরও বাড়ি ছাড়েন নি, অথবা কোয়ার্টারের একটি অংশ অন্য কাউকে সাবলেট করেছেন। যাঁরা রিটায়ার করার পরও কোয়ার্টার ছাড়েন নি খবর নিলে জানা যাবে তাঁরা পেনসন ও গ্র্যাচুয়েটির টাকা পান নি তাই বাধ্য হয়ে কোয়ার্টারেই থেকে গেছেন। এখনও অবসরপ্রাপ্ত বন্দর কর্মচারীদের অনেকেই দেখা যাবে শুধু আসছেন আর যাচ্ছেন, জুতোর শুকতলা ক্ষয় হচ্ছে পেনসন আর জুটছে না। যাদের বাড়িতে অন্যেরা থাকেন তাদের কথাঃ আত্মীয় স্বজন কিংবা গাঁয়ের লোক এলে কী করব? তাড়িয়ে দেবো।

তরুণ দত্তের শৃঙ্খলা রক্ষার রীতিতে অফিসার আর তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যে অনেক ফারাক আছে। ডেপুটি চেয়ারম্যান অনিমেষ রায় কিংবা অমল চক্রবর্তীদের কখনোই জিজ্ঞেস করা সম্ভব না যে তাদের সল্টলেক অথবা গড়িয়াহাটে ফ্ল্যাট কিংবা বাড়ি আছে কিনা। তরুণ দত্তের বিধানে পোর্টল্যান্ডে পার্কের আমলা আর পোর্ট ট্রাস্টের তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এক বস্তু নয়। এদের সমভাবে দেখার প্রশ্নই ওঠে না।

ছবি : শিশির কর্মকার

ধবিতলায় পড়ে থাকা খালি জমি

এখন, এই সমস্ত সমস্যার সামগ্রিক প্রভাবে ১৯৮০-র সময় থেকে কলকাতা বন্দরের অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় রীতি মত সংকটময়। ঐ বছর মে মাসের পর থেকে কলকাতা বন্দরাভিমুখী জাহাজের সর্বনিম্ন গড়-সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় মাত্র ১৮। উল্লেখযোগ্য হ্রাস দেখা যায় আমদানি ও রপ্তানি উভয়ের পরিমাণেই, একটি হিসেব থেকে দেখা যায়, ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০-৮৪-র মধ্যে কলকাতা বন্দরে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছিল প্রায় ৩০%। আর ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৭৬-৭৭এ এসে কলকাতা বন্দরের G.R.T. সেই যে ৬.৬৭ নিযুত মেট্রিক টন কমে গিয়েছিল সেই ঘাটতির প্রায় ৬৩% পূরণ করতেই কলকাতা বন্দরকে ১৯৮০-৮১ পার করতে হয়েছিল।

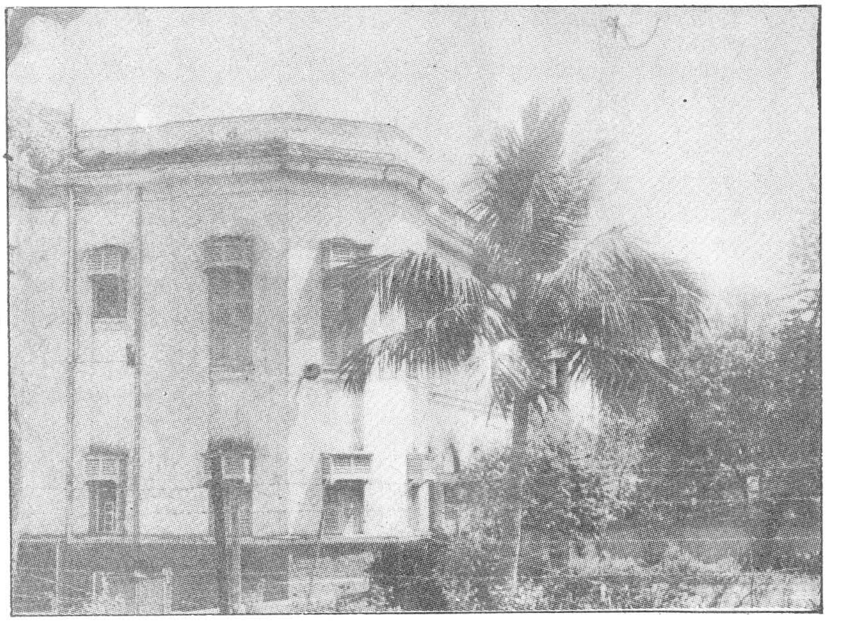

আশার কথা এই যে, ১৯৮০-৮১-র পর থেকে কলকাতা বন্দরের ক্রমাবনতিকে ক্রমশ: সরিয়ে দিয়ে তার জায়গা নিচ্ছে উন্নত কর্মতৎপরতার বিভিন্ন লক্ষণ ফলতঃ ১৯৭৫-৭৬ এ কলকাতা বন্দরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যতটা অনিশ্চয়তা দানা বেঁধেছিল, তার অনেকটাই অপসারিত হতে পেরেছে ১৯৮২-র পর থেকে আজ পর্যন্ত। কলকাতা ও হলদিয়ার ডক কমপ্লেক্সের বিচ্ছিন্নকরণের প্রসঙ্গটি সম্ভবতঃ এই কারণেই আজ প্রায় একটি ডেড ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ মনে করা যায় যে অনেক সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণায় কলকাতা বন্দরের ক্রমাবনতির কারণগুলির মধ্যে যেগুলি ছিল প্রধান, তার পেছনে অনেকাংশেই দায়ি ছিল এই বন্দরের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এক অযৌক্তিক ঔদাসীন্য ও হয়তো উদ্দেশ্য প্রণোদিত অবহেলা। এ প্রসঙ্গে উৎসাহী পাঠক ফরাক্কা-প্রসঙ্গ প্রভৃতির আনুষঙ্গিক রিপোর্টগুলি খতিয়ে দেখতে পারেন। এছাড়াও, কিছু কিছু মহলে এরকম কানাঘুষোও উঠেছিল যে কলকাতা বন্দরের ওপর তথাকথিত বিচ্ছিন্নকরণের প্রভাব নিরপেক্ষ হলদিয়ার কাছে একটি উন্নত ও আধুনিক নেভাল কমপ্লেক্স নির্মাণ করাই ছিলো এ ব্যাপারে কেন্দ্রের গূঢ় উদ্দেশ্য। এসব কথার উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক এ কারণেই সে কলকাতা বন্দরের বর্তমান কর্মতৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে ওই কেন্দ্রীয় 'অবহেলার' মাত্রাও কিছুটা যেন বিস্ময়কর ভাবেই কমতির দিকে।

আরো একটু বিশ্লেষণমূলক ভাবে দেখলে, কলকাতা বন্দরে ব্যবহার্যতার অবনতির মূল ছবিটি এইরকম--হুগলীর নাব্যতা কমে আসার ফলে এই বন্দরে বড় বড় জাহাজ আসার সুযোগ হয়েছিল ক্রমহ্রাসমান, যখন অপরদিকে বিশ্ব জাহাজী শিল্পে বড় বড় জাহাজের চাহিদার গতি ছিল ঊর্ধমুখী। বড় বড় জাহাজের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেটি বেড়েছে সেটি হল কনটেইনার সার্ভিসের চাহিদা। লক্ষ্যণীয় যে, কনটেইনারবাহী জাহাজের ব্যবহার-বাড়ার ফলশ্রুতি হিসেবে জাহাজী শিল্পের অনেকগুলি চিরপরিচিত অসুবিধেও ক্রমশ কমিয়ে আনা সম্ভব। এই অসুবিধেগুলি হল:

ক) আলগা ও এলোমেলোভাবে মাল-ওঠানো নামানোর ফলে মালের নানাবিধ ক্ষতির সম্ভাবনা ("চুরি" উপযোগহ্রাস প্রভৃতি এসব ক্ষতির একটা বড় উপাদান);

খ) আলগা মাল ওঠানো নামানোর ব্যবস্থায় বেশি সময় ব্যয়িত হবার সম্ভাবনা এবং

গ) আলগা মাল ওঠানো নামানোর ব্যবস্থায় শিপিং এস্ট্যাবলিশমেন্ট ও অন্যান্য খাতে প্রভূত ব্যয়াধিক্য। এই শেষেরটির প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কনটেইনার বিহীন ব্যবস্থায় কলকাতা বন্দরে মাল ওঠাতে-নামাতে একেকটি মাঝারি মাপের জাহাজের গড় খরচ পড়ে দৈনিক প্রায় ৫০,০০০ টাকা, বলা বাহুল্য, কনটেইনার সার্ভিসের ব্যবস্থায় এই সবকটি সমস্যাই অনেকটা কমিয়ে আনা যায়।

এখন, ফরাক্কা থেকে হুগলীতে জলসরবরাহের বিতর্কিত ইস্যুটি দূরে রেখে বলা যায়, কলকাতা বন্দরে অন্ততঃ কনটেইনার ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা বাড়াতে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারও কিছু উৎসাহের প্রমাণ দিয়েছে। এই উৎসাহের একটি বড় কারণ সম্ভবতঃ কলকাতা বন্দরের প্রধান অঞ্চলে (অর্থাৎ হলদিয়া বাদে কলকাতা বন্দরে) কনটেইনারবাহী জাহাজগুলিকে নিয়ে আসার জন্য বড় বড় দেশি বিদেশি জাহাজী মহলের বিশেষ আগ্রহ। এই আগ্রহের কারণগুলি আবার:

১) কলকাতা শহরের নিকটতম এলাকায় যানবাহন ইত্যাদি 'ইন্‌ফ্রাস্ট্রাক্‌চারাল ফেসিলিটি'-র বিরাট সুব্যবস্থা এবং

২) কলকাতা বন্দরের মূল অঞ্চলে ড্রাই-ডকিং এর বিশেষ সুব্যবস্থা। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে কলকাতা বন্দর একটি প্রান্তিক বন্দর হওয়ায় এখানে ড্রাইডকিং এর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে কলকাতার স্থান ভারতের মধ্যে এ কারণেই অগ্রগণ্য যে, ভারতের ১০ টি বড় ড্রাইডকের মধ্যে ৫-টির অবস্থিতি কলকাতায় এবং যে, সর্বোপরি ড্রাইডকিং এর ক্ষেত্রে কলকাতা বন্দর এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী।

কলকাতা বন্দরের ক্রমোন্নতির বর্তমান পর্যায়ে কনটেইনার সার্ভিসের ব্যবস্থা ছাড়াও ড্রাইডকিং ইত্যাদির সুযোগ সুবিধাগুলিকেও আরো উন্নতমানের করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এবং এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে কিছুটা উৎসাহ দেখিয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এবার কিছু উপাত্তের দিকে তাকানো যাক। প্রথমেই বলা যায়, ১৯৮২-তে

কলকাতায় কন্‌টেইনার ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে ভারতসরকার কর্তৃক আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কন্‌টেইনার কন্‌সালটান্ট Filixtowe Port Authority-র নিয়োগের কথা। F.P.A. কলকাতার এন এস ডকে কন্‌টেইনার সার্ভিস ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যা যা সুপারিশ করেছিলেন সেগুলি হল ঃ (১) বাঁধানো শোর পয়েন্ট নির্মাণ;

২) পরিচ্ছন্ন, স্থানসংকুল এবং সু-আলোকিত নদীতট;

৩) কার্গো শেড ইত্যাদিতে মালবহনের রাস্তার উন্নতি সাধন;

৪) একটি পৃথক কন্‌টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ;

৫) গ্যাণ্ট্রি, পোর্টেইনার ট্রান্সটেইনার প্রভৃতি উন্নতমানের ক্রেনের বন্দোবস্ত।

আশার কথা যে কেন্দ্রীয় সরকার এই সুপারিশগুলি মেনে নেন এবং ১৯৮৪-র অক্টোবর থেকে কন্‌টেইনার সার্ভিসের উন্নতিকল্পে রচিত একটি পরিকল্পনার প্রথম স্তরটির সূচনা করেন; এজন্য আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয় ১০.৬৩ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনার বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুটি লক্ষ্যমাত্রা হল প্রায় ৯০,০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি কন্‌টেইনার ফ্রেইট্‌ স্টেশন নির্মাণ এবং অন্তত দুটি বৃহৎ গ্যাণ্ট্রিক্রেণ ক্রয়। এছাড়া সি.পি.টি. কর্তৃপক্ষ স্বয়ং খিদিরপুর ডকের উন্নতির একটি বড় পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন।

আশা করা যাচ্ছে যে এসব পরিকল্পনার ফলে কলকাতা বন্দরে কন্‌টেইনার ব্যবহার ক্ষমতা প্রায় ৭৩% বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য এই বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে ১৯৮৩-৮৪-র আর্থিক বছর থেকেই। বিশেষতঃ চলতি আর্থিক বছর ১৯৮৪-৮৫ তে কলকাতা বন্দরে কন্‌টেইনার হ্যান্ডলিং এর পরিমাণ ছিলো ৩৬,০০০T.E.U এবং আশা করা যাচ্ছে যে আগামী দু-এক বছরের মধ্যেই এই সংখ্যাটি ৪৫,০০০ T.E.U. কে অতিক্রম করে যাবে। ১৯৭৮-৭৯-র আর্থিক বছরের প্রাসঙ্গিক সংখ্যাটির তুলনায় এই লক্ষ্যমাত্রা ন্যূনপক্ষে প্রায় ৫.৪৩% বেশি।

আরো কয়েকটি খবর থেকে কলকাতা বন্দরে কন্‌টেইনার হ্যান্ডলিং এর এই উন্নতির ছবিটি ধরা পড়ে।

প্রথমেই বলা যায় পৃথিবীর বৃহত্তম কন্‌টেনার লাইনার U.S.Lines কর্তৃক কলকাতায় তাদের বৃহৎ কন্‌টেইনার বাহী জাহাজ M.V "Hooghly Pioneer"-

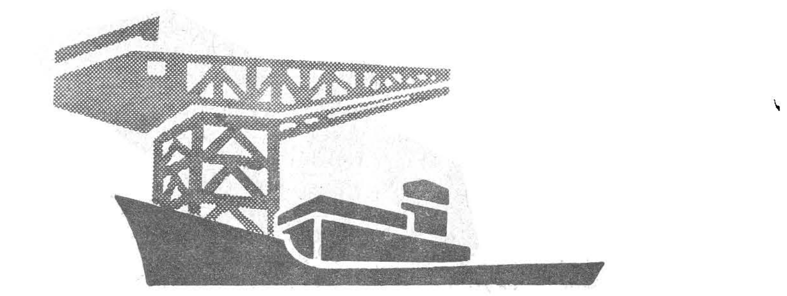

জমিদারি কান্ডকারখানা

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঠিক প্রবেশপথে, সি. পি. টির ট্র্যাফিক বিল্ডিং-এর বিপরীত দিকে পোর্ট ট্রাস্টের বিরাট এক ভূখন্ড পড়ে আছে যেখানে আরেকটি ময়দান হতে পারে। পরিমাণ সাড়ে তিন লাখ বর্গমিটার অথবা ৫৩০০ কাঠা কিংবা ২৬৫ বিঘা। সি. পি. টি এই জমিটা সংরক্ষিত করে রেখেছিল কনটেনার টার্মিনালের জন্য। আধুনিক বন্দরে জাহাজ মাল বোঝাই ও খালাস করার ব্যবস্থা তার নামই কনটেনার সার্ভিস, লোকসানের অঙ্ক দিন দিন স্ফীত হতে থাকায় সি. পি. টি কর্তৃপক্ষ এই কনটেনার সার্ভিসের মূল্য উপলব্ধি করেন এবং সেইজন্য জমি বরাদ্দ করা হয়।

হালে ঐ বিরাট ময়দানের পাঁচ ভাগের এক ভাগ এক ভাগ্যবানকে লিজ দেওয়া হয়েছে। জমির পরিমাণ সত্তর হাজার বর্গমিটার অথবা ১০৫০ কাঠা। বাজারে ঐ জমির দাম এখন কম করে কাঠা প্রতি লাখ টাকা। কিন্তু বন্দর কর্তৃপক্ষ এই জমি লিজ দিয়েছেন জলের দামে। কাঠা প্রতি মাত্র ছ টাকা আশি পয়সা

ওখানকার এক কাঠা জমি বিক্রী করে ব্যাঙ্কে টাকাটা গচ্ছিত রাখলে মাসে সুদই পাওয়া যায় হাজার টাকা। কিন্তু ওঁরা মাসিক ভাড়া বরাদ্দ করলেন ছ টাকা আশি পয়সা। এই ব্যাপারে কোন হেতু দেখানো হয় নি। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ইচ্ছুক ক্রেতাদের কিছু জানানোও হয় নি। নিজেদের মর্জিমত ওঁরা শুধু ভাড়াই ঠিক করেননি তার আগে ভাড়াটিয়াদের নির্বাচন করেছেন।

১৯৭৬-এর দুই সদস্যের কমিটি বন্দরের জমি বিক্রি ভাড়া অথবা লিজ দেওয়ার ক্ষেত্রে কতকগুলি নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন এসব ব্যাপারে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। সবচেয়ে যে বেশী দর দেবে তাঁর হাতেই জমি বা বাড়ি তুলে দিতে হবে। কারণ, তাঁরা দেখিয়েছিলেন কলকাতার তুলনায় বম্বে পোর্টট্রাস্টের জমির পরিমাণ তিন ভাগের এক ভাগ কিন্তু তাদের আয়ের পরিমাণ তিনগুণ। এক্ষেত্রে কমিটির সুস্পষ্ট নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান হয়েছে। শুধু তাই নয় এক কাঠা জমির বাড়িতে সি. পি. টির একজন কর্মচারীকেও যেখানে মাসে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিতে হয় সেখানে কিছু ব্যাবসায়ীকে জলের দামে জমি দিয়ে মুনাফা লুঠবার পথ খুলে দেওয়া হয়েছে।

এই ব্যবসায়ীরা আবার যে সে ব্যবসায়ী নয়। এদের সকলের সঙ্গেই সি পি টির অবসরপ্রাপ্ত কিছু ভাগ্যবান জড়িত আছেন। যেমন ডি এম ডি (ডিরেকটর ম্যারাইন ডিপার্টমেন্ট) পি এন বাটরা, ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টের নরেন মিত্র এবং চিফ ইঞ্জিনিয়ারস ডিপার্টমেন্টের পরিমল চক্রবর্তী। অবসরপ্রাপ্ত ভাগ্যবানদের নিয়োগ করলে যে সি পি টির অধীশ্বরদের মন গলানো অনেক সহজ তা এই ব্যাপারেও বোঝা যাবে।

যে জমি লিজ দেওয়া হয়েছে সে কিন্তু গড়ের মাঠের মত সাধারণ জমি নয়। সি. পি. টি এক কোটি টাকা খরচা করে তার উন্নতি সাধন করেছে। সেখান জল আলো রাস্তা এবং ড্রেনের ব্যাবস্থা করা হয়েছে।

সদাশয় সি পি টি লিজ দলিলে স্বত: প্রবৃত্ত হয়ে কবুল করেছেন, পাঁচ বছর আগে তারা যদি এই জমি ফেরত চান নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ তারা দেবেন।

জমি যাঁরা লিজ পেয়েছেন তাঁদের তালিকার মাথায় আছেন শ ওয়ালেস। আছেন সি হর্স, ইন্ডিয়ান কন্টেনার সার্ভিস প্রভৃতিও।

কলকাতা বন্দরে যে রীতিটি চালু আছে তা হল সাহেবদের খুশী করে জলের দামে জমি লিজ দাও, তারপর মোটা টাকায় সাব লিজ দিয়ে চল। ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে মোটা সেলামী নাও। ঐ রীতি চালু আছে বলেই বম্বে বন্দরের তিন গুন জমি থাকলেও জমি বাবদ কলকাতা বন্দরের আয় বম্বের তিন ভাগের এক ভাগ। কলকাতায় নেপোরা আগেও দই খেত এখনো খায়। ধবিতলায় এই রীতির ব্যতিক্রম হবে এমন কথা কে বলতে পারে।

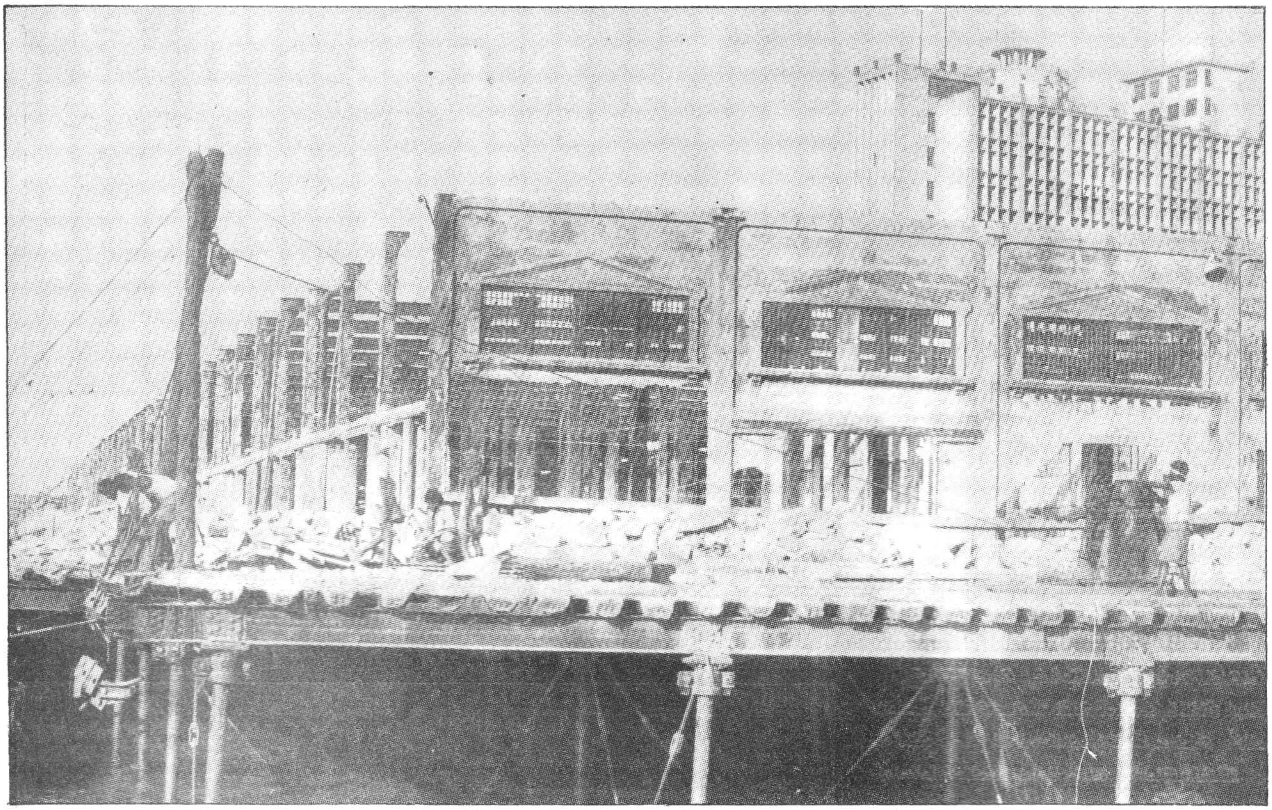

এর প্রেরণের কথা। মাত্র গত ১০ মার্চ (১৯৮৫) এই জাহাজ এসেছিল কলকাতা বন্দরে এবং এই জাহাজটির ওপর গত ১২ মার্চ কলকাতা দূরদর্শন থেকে একটি সমীক্ষাও প্রচারিত হয়েছিল। কলকাতা বন্দরের মূল কেন্দ্রে কন্টেইনার সার্ভিসের উন্নতিতে যে আন্তর্জাতিক বৃহৎ জাহাজী শিল্প ও উৎসাহী--তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ সম্ভবতঃ এইটিই।

এ-প্রসঙ্গে এও উল্লেখ করা যায় যে ছোটা বড় জাহাজ মিলিয়ে গত দু-বছরে কলকাতা বন্দরে মোট ২৫ টি কন্টেইনার বাহী জাহাজ এসেছে। এর আগের বছরগুলির তুলনায় এই ঘটনাটিও কলকাতা বন্দরের উন্নতির একটি প্রমাণ।

একই সঙ্গে উন্নতি হয়েছে হুগলীর নাব্যতারও। আগে যেখানে কলকাতা বন্দরের মূলকেন্দ্রে জাহাজের ড্রাফ্‌ট থাকতো গড়ে ২৫ ফিট (ও হলদিয়ায় কিছুটা বেশি), বর্তমানে ড্রাফটের এই গড় বেড়ে দাঁড়িয়েছে সম্ভবতঃ ২৯ ফিটের কিছু বেশিই। হুগলীর নাব্যতা ও বড় বড় জাহাজের জন্য সম্ভাব্যড্রাফট আরো বাড়ানোর জন্য ১৯৮২-র ডিসেম্বর থেকে এক বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিখ্যাত ওলন্দাজ বিশেষজ্ঞ E. Allersma-র তত্ত্বাবধানে স্যান্ডহেড্ থেকে সি.পি.টি. অবধি প্রায় ১২৬ মাইল নদীপথের খননকার্য চলছে ঘড়ির কাঁটা ধরে। নাব্যতার উন্নতির এই ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেছেন প্রায় ৪০ কোটি টাকা।

ড্রাইডকিং-এর ক্ষেত্রে কলকাতা বন্দরের কর্মতৎপরতার কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৮৪-র অক্টোবরে অনুমোদিত আরও একটি পরিকল্পনার কথা যার লক্ষ্য হল, কলকাতা বন্দরের মূল অঞ্চলে একটি জাহাজ মেরামত কমপ্লেক্স গড়ে তোলা। নির্মীয়মান এই কমপ্লেক্সটির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আলাদাভাবে ৪.৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। এই পরিকল্পনাটির একটি বিশেষ লক্ষ্য হল জাহাজ মেরামতের বহুক্ষেত্রে কায়িক শ্রমের বদলে ইলেকট্রনিক যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার প্রবর্তন।

এই সমস্ত পরিকল্পনার ও কর্মতৎপরতার সামগ্রিক ফলশ্রুতি হিসেবে কলকাতার বন্দরে জাহাজের বার্ষিক অগামন যেমন বেড়েছে তেমনি অপরদিকে ক্রমশ কমতে শুরু করেছে শ্রমিক অসন্তোষ ও আরও নানা আনুষঙ্গিক সমস্যা। এর একটা বড় প্রমাণ এই যে, ১৯৭৯-৮০ তে এই বন্দরে যেখানে প্রায় ৯২,০০০ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল সেখানে ১৯৮৩-৮৪ ও প্রায় শেষ হয়ে আসা চলতি আর্থিক বছরে ঐ সংখ্যাটি প্রায় ৯২% কমে এসেছে। এর আরও একটি প্রমাণ এই যে, ১৯৮১-র জুনে শ্রমিক অসন্তোষ কমানোর জন্য যে grievance Redress Cell টি, সি.পি.টি. কর্তৃপক্ষ গঠন করেন, সেটির কোন বিশেষ কাজকর্মই আজ প্রায় নেই বললেও চলে। অবশ্যই এর কারণ কলকাতা বন্দরে শ্রমিক অসন্তোষের কমে আসা এবং হিউম্যান ম্যানেজমেণ্ট পরিস্থিতির সামগ্রিক উন্নতি।

কাজে কাজেই কলকাতা বন্দর যে তার ক্রমাবনতির বিরুদ্ধে স্বয়ং একটু রুখে দাঁড়াতে পেরেছে ও পারছে এ কথা খুব কিছু অত্যুক্তি নয়। □

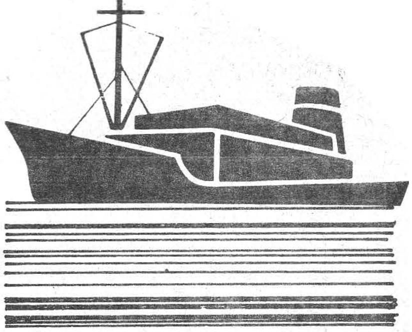

Reach for Rupabani
The Most Reasonably
Priced Colour TV

Introducing Rupabani
A splendid Colour TV
One Shade Brighter Than Life

A product of indigenous technology from Trident.

* Smart looks.
* Ruggedly built.
* Unmatched quality.
* Most economically priced.
* Can be serviced anywhere in India being indigenous technology
* Our C.T V is approved by Dept. of Electronics. Govt. of India.

TRIDENT
ELECTRONICS
TRIDENT
6, Madan Street, Calcutta 700072 Phone 26-1484

Factory 119/16, Biren Roy Road (East), Maitipara
Calcutta—700041, 24 Parganas, West Bengal

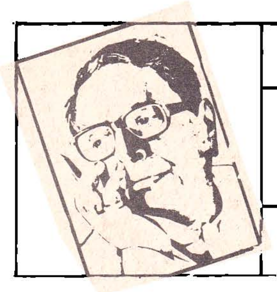

ধারাবাহিক

মরজি মহল

বনফুল

।। ১৭ অক্টোবর ১৯৭৫ ।।

কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু কাজের বেলায় ঠিক কাজটি করি না এবং না করবার অজুহাত হিসাবে অনেক রকম যুক্তি খাড়া করি। লোককে ধাপ্পা দিই এবং মনকে চোখ ঠারি। বিলাস-প্রমত্ত যান্ত্রিক সভ্যতার এই প্রবণতাটা বেড়েই চলেছে। আমরা ক্রমশই যন্ত্রের এবং বিলাসিতার দাস হয়ে পড়ছি। আধুনিক এই দাস-প্রথার এবং ক্রীতদাসদের ভবিষ্যৎ কি? একমাত্র ভবিষ্যৎ কতকগুলি বুদ্ধিমান দাস-ব্যবসায়ী এদের নিয়ে ব্যবসা করে নিজেরা বড়লোক হবে।

কাম ক্রোধ লোভ আর মাৎসর্য্য মোহ
চিরকাল করে যাবে মহাসমারোহ
কারো গায়ে লেখা থাকবে
আমি গণতন্ত্র
কেউ বলবে আমরা পড়ি সাম্যের মন্ত্র
কিন্তু ধনীর পায়ের তলে
বাঁধা থাকবে সব শালা
যাঁরা চড়েন 'রোল্‌স রইস্‌'
কিম্বা হাঁকান 'আমপালা'

।। ১৮ অক্টোবর ১৯৭৫ ।।

আজ কাগজে দেখলাম--নূতন অর্ডনান্স জারি হয়েছে একটা। 'মিসায়' যাদের স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে তাদের কেন আটকানো হচ্ছে তার কোন কারণ দেখানো হবে না।

সত্যি একটা রাজ্য চালাতে গেলে কতরকমই না করতে হয় আমাদের দেশে গণতন্ত্রের আঁচ এখন গনগন করে জ্বলছে। আর বনবন করে ঘুরছে মৈত্রীর পাখাটা। আমরা সব দেশের সংগে মৈত্রী করতে চাই। এই পর্যন্ত লিখেছি এমন সময় কানে এল 'চাট্টি খেতে দাও মা। দু'দিন খেতে পাই নি।'

ওই হতভাগা ভিখারীটা কি জানে যে আমরা কত দ্রুতবেগে প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছি? প্রগতি কাকে বলে তা-ও বোধহয় ও জানে না। ও জানে—ক্ষিদে পেয়েছে কিন্তু খাবার পাচ্ছি না।

ভিখারী ও শিকারীর মিল আছে
পদ্যের দুনিয়ায়
ছন্দের কাটে না কো তাল
গদ্যের দুনিয়ায় কিন্তু রে হায় হায়
তফাত যে আকাশ পাতাল।

।। ১৯ অক্টোবর ১৯৭৫ ।।

আজ কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা। মা আজ রাত্রে দেখতে আসবেন কারা জেগে আছে। দেখবেন অধিকাংশ লোকই ঘুমুচ্ছে তিনি জোর করে কাউকে জাগাবেন না। জেগে থাকবার জন্য অর্ডিনান্স জারি করবেন না। তিনি শুধু দেখে যাবেন। দেবতাদের রাজ্যে গণতন্ত্র নেই। প্রত্যেকেই সেখানে এক-নায়ক বা এক-নায়িকা। যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু মজা এই কখনও কিছু করেন না। যা হয় আমরা মনে করি আমার অদৃষ্টের লিখন এই ছিল তাই হয়েছে। আবার কেউ কেউ বা ভাবি যা হয়েছে তা আমারই গুণের জন্য বা দোষের জন্য।

শক্তিমান দেবতারা সবাই খুব নির্বিকার
তাঁহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয় না তাই
বরং তাঁদের পূজা করি সাজিয়ে নানা উপচার
আশা করি ফাঁকতালেতে যদি কিছু পেয়ে যাই।

।। ২০ অক্টোবর ১৯৭৫ ।।

কিসিংজার (গার?) পিকিং গেছেন, ফোর্ডও নাকি যাবেন, আমাদের দেশের মিল-ওলারা সওয়া দুই লক্ষ টন চাল গভর্ণমেন্টকে দেবেন, দেশ থেকে আরও লোহা বিদেশে চালান যাবে। অ্যাংগোলার যুদ্ধে দুলক্ষ লোক অদ্যাবধি মারা গেছে। শেখ আবদুল্লা (দাল্লা?) নাটকীয় ভাবে ন্যাশানাল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। নেপালের সংগে আমাদের বাণিজ্য চুক্তি হচ্ছে কাগজে এসব পড়তে পড়তে হঠাৎ মনে হল-এ সবই তো পরের চরখা, এসবে মনোযোগের তৈল দিয়ে যাচ্ছি—আমার নিজের চরকায় যে তেল নেই। খটখট করছে। হঠাৎ আবার মনে হল আমার চরখাই তো নেই তাই পরের চরখায় তেল দিয়ে বেড়াই। টুকে পরীক্ষায় পাস করছি, রকে আড্ডা মারি। কাগজ পড়ি আর সুবিধা পেলে সিনেমা দেখি। আমার চরখা নেই। তাই পরের চরখায় তেল দিয়ে বেড়াই।

।। ২১ অক্টোবর ১৯৭৫ ।।

গৌরের মা (যে আমার অসুস্থ স্ত্রীর সেবা করত) সে কয়েকদিন আগে কাউকে কিছু না বলে সরে পড়েছে। তার জায়গায় আর একটি মেয়েকে আজ বাহাল করা হল। নাম মালতী। বেহারী মেয়ে। জাতে কুর্মী বাংলা বলতে পারে।

এ জীবনে কত লোক আসিল ও গেল
কেউ রেখে গেছে কিছু স্নেহময় স্মৃতি
অনেকেরই কথা আজ মনে নাই মনে নাই
দেয় নাই পায় নাই কোন প্রেম-প্রীতি
নিয়েছে বেতন খালি নিয়মিত রেটে
লম্বা মাঝারি কেউ, কেউ ছিল বেঁটে।

একটু আগে রোদ ছিল
সোনার রাজ্য রমারম।
তারপরই বৃষ্টি এল
ঝম ঝম ঝম ঝমাঝম্‌।

বৃষ্টি থামল একটু পরে
মেঘরা সব চলল
পেয়েছি পেয়েছি পেয়েছি রে
গোশালিকরা বলল।

সন্ধ্যাবেলা মালতীও চলে গেল। তার স্বামী এসেছে।

।। ২২ অক্টোবর ১৯৭৫ ।।

রাশিয়া তো শ্রমিকের দেশ। সেখানে সবাই শুনেছি কর্মী। কিন্তু আজ কাগজে একটা খবর পড়ে আশ্চর্য হলাম—তাঁরা আমেরিকার কাছে পাঁচ বছর ধরে খাদ্যশস্য কিনবে। অর্থাৎ নিজের খাবারটাও তারা উৎপাদন করতে পারছে না। শ্রমিকরা কি নিয়ে শ্রম করছে তাহলে? খালি রাস্তা-ঘাট, ফ্যাকটারি, কামান বন্দুক এটম বোমা বানাচ্ছে?

পেটের অন্ন আগে চাই
এটা তাদের জ্ঞান নাই?

এ-ও অবশ্য হতে পারে খাদ্যশস্য কেনাকেনি ব্যাপারটা বাইরের অভিনয়, ভিতরে ভিতরে হয়তো এটার মধ্যে কোনও পলিটিকাল উদ্দেশ্য আছে। মা-ও দেখছি আমেরিকার দূত কিসিংগারকে এ বিষয়ে একটু হুমকি দিয়েছেন।

আমরা সবাই গোলা লোক
কেউ পাঁঠা কেউ খাসি।
কাগজে যা পড়ি
অমনি তড়িঘড়ি
নাচিয়ে ভুরু, হো হো করে হাসি।

।। ২৩ অক্টোবর ১৯৭৫ ।।

আজ দুটি মস্ত খবর
(১) বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবি মারা গেছেন। তাঁর বিখ্যাত বই—Study of History অমর সৃষ্টি।
(২) শুক্রগ্রহে অবতরণ করেছে রুশ মহাকাশযান। শুক্রগ্রহ শুনেছি মেঘে ঢাকা। মেঘবাহন ইন্দ্রের রাজত্ব সেটা। সেখানে এবার মেঘনাদরা গেলেন। দেখা যাক এরপর কি হয়।

আজ ভূতের মুখে রামনাম শোনা গেল। ভুট্টো বলেছেন—দিল্লীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক চাই।

মুখে কেবল চাই চাই
কাজের বেলা কিছু নাই
এ ধরনের ধাপ্পা
আর কতকাল
চালাবে হে বাপ্পা।

আজ দুটি লোভী কাককে এবং দুটি লোভী শালিককে রুটি খাইয়েছি। ভারি আনন্দ পেলাম।

উত্তরেতে হিমালয় দক্ষিণে সাগর
এরি মাঝে ক্রীড়া করে অনেক নাগর
কেউ বা নাগরী পেয়ে মন তার ভোলায়
কেউ বা ঘুরিয়া মরে খালি নাগরদোলায়।

।। ২৪ অক্টোবর ১৯৭৫ ।।

ইন্দিরা ঘোষণা করেছেন
সর্বস্তর থেকে অযোগ্যতা করবেন নির্মূল
ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়লে
ছুটে আসবে লক্ষ লক্ষ ভীমরুল
এবং ফোটাবে হুল
লোম বাছতে গেলে কম্বলই হয়তো
থাকবে না বিলকুল।
শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে
আগা-পাশ-তলা চাবকালে
হয়তো পানি মিলতে পারে হালে
গণতান্ত্রিক সংবিধানে কিন্তু তা চলবে কি
দুনিয়ার লোক বলবে কি?
অসাধুতা, এবং অযোগ্যতা
খানদানি এসব মাল আমাদের মর্মে আছে পোঁতা
খুঁড়তে গেলেই সাপ বেরুবে
গোখরো,কেউটে, শঙ্খচূড়, বোড়া
ইঁদুর বলবে আমি হাতী
ছাগল বলবে আমরা সব ঘোড়া
ভয়ংকর মূর্তি ধরবে নানারকম স্বার্থ
ইন্দিরাজী হয়ে যাবেন ব্যর্থ।
তবু বলি—ইন্দিরাজীর জয় জয়
কোথা গলদ এটা তিনি করেছেন নির্ণয়।

।। ২৫ অক্টোবর ১৯৭৫ ।।

আগে বড়লোকেরা গরীব লোকদের ব্যাগার খাটাতো। সেটা আইনত বন্ধ হয়ে গেল। এতদিন এ আইন হয় নি কেন? গরীবরা বড়লোকদের ব্যাগার বহুকাল থেকে খাটছে। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতেও খাটবে এ আইন হওয়া সত্ত্বেও। কারণ অনুগ্রহপ্রার্থী গরীবরাই চিরকাল অনুগ্রহদাতা বড়লোকদের হয়। এখনও হবে।

ভাত ছড়ালে আসবে কাক
লক্ষ্মী পূজোয় বাজবে শাঁক
'ফেবার' (Favour) পেলেই
লেবার (Labour) দল
খাটবে ব্যাগার অনর্গল।
বিনা স্বার্থে টিপছে পা
এমন নজির মিলবে না।

ক্রীতদাস প্রথা আইন করে তুলে দেওয়া হয়েছে বহুকাল আগেই।

তবু দেখি আজকাল ক্রীত দাস দাসী
বাজারেতে ঘোরে ফেরে রাশি রাশি রাশি।
'কে নিবি গো কিনে আমায়'
শুনছি সর্বদাই
আসল সমস্যাটা—ক্রেতা বেশী নাই।

।। ২৬ অক্টোবর ১৯৭৫ ।।

কাগজে দেখলাম কবিশেখর কালিদাস রায় কাল রাত্রে মারা গেছেন। অনেকদিন ধরে ভুগছিলেন, মুক্তি পেলেন। আমি মাঝে ২বার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কথা বলতে পারলেন না, কথা শুনতেও বোধহয় পাচ্ছিলেন না। আমাদের

সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন তিনি। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।'

তাঁর পান্ডিত্যও ছিল গভীর। শিক্ষক হিসাবেও তাঁর অনেক খ্যাতি শুনেছি।

বাগান আলো করেছিল
 যে ফুলটি আজ গেল ঝরে
ইতিহাসে স্মৃতি তাহার
 কতক্ষণ রাখবে ধরে?
ইতিহাসও লুপ্ত হবে
 কিছু শেষে থাকবে না
সবাই মোরা হারিয়ে যাব
 মহাশূন্যে মহাম্বরে।

।। ২৭ অক্টোবর ১৯৭৫।।

আজ কাগজে তেমন উত্তেজক কোনও খবর নেই। কালকের Statesman-এ একটি ছবি দেখেছিলাম সেইটির কথাই বারবার মনে পড়ছে। মাও সে তুং কিসিংগারের সঙ্গে করমর্দন করছেন।

মনে হল মাও সে তুং যেন অতি প্রাচীন প্রাচ্যের প্রতীক। মুখের ভাবে, শক্তি, ভদ্রতা, বিজ্ঞতা, এবং গাম্ভীর্য যেন মূর্ত হয়ে আছে। কিসিংগারের মুখটা আধুনিক ছোকরার চেহারা। হিমালয়ের সম্মুখে যেন বল্মীক

পাড়ার ডক্টর বলাই কুন্ডুর বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে। গয়না, রূপোর বাসন, একটা 'Cat's eye (বৈদূর্য) পাথর সব নিয়ে গেছে। ঝিয়ের উপর বাড়ি রেখে তাঁরা বাইরে গিয়েছিলেন। রোজই এ ধরনের খবর শুনি। অদ্ভুত জাত।

সর্বাঙ্গ দাদ ছুলি প্যাঁচড়া
চুরি আর পেজোমির ছ্যাচড়া।
কাজ তো করে না—কাজে দেয় বাগড়া
পিঠে চাবুকের দাগ দাগড়া ও দাগড়া।

।। ২৮ অক্টোবর ১৯৭৫।।

আজ সকালেই আর একটি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেলাম। বিখ্যাত কার্টুনিস্ট কাফি খাঁ কাল রাত্রে হঠাৎ মারা গেছেন। তাঁর নাম ছিল প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী। প্রথম জীবনে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। কয়েকদিন আগে ফোন করেছিলেন। এত শীঘ্র তাঁকে হারাব তা কল্পনাতীত ছিল। তাঁর 'খুড়ো' বাংলা কার্টুন জগতে অমর হয়ে থাকবে।

অনেক ডাল অনেক পাত্রে
 অনেকক্ষণ ফুটছে
 কেউ কিন্তু গলছে না
পুরাতন প্রদীপগুলি
 একে একে নিবছে
 নূতন দীপ জ্বলছে না।
হয়তো জ্বলবে কোথাও কোথাও
 নজরেতে পড়ছে না
কাদার তাল ঘাঁটছে সবাই
 প্রতিমা কেউ গড়ছে না।
 এই দেখছি অনুক্ষণ
কাদা নিয়ে দাদার দল
 দিচ্ছে জোর বিজ্ঞাপন।

।। ২৯ অক্টোবর ১৯৭৫।।

আজ Statesman কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে Domocracy to suit needs of the country, says Mrs. Gandhi – পড়েই কেন জানি না গীতার সেই কথাটা মনে পড়ল – পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

আনন্দবাজারের একটা খবরে দেখলাম (সত্যি কিনা জানি না, কারণ খবরটা স্টেটস্‌ম্যানে নেই) – নতুন অর্ডিনান্স করে আইন বদলে রমা চৌধুরীকে রবীন্দ্রভারতী থেকে তাড়িয়ে তার জায়গায় প্রতুল গুপ্তকে বসানো হবে। দ্বিতীয় সংবাদটি প্রথম সংবাদের পরিপূরক কিনা বুঝতে পারলাম না। আমরা কি-ই বা বুঝতে পারি! র‍্যাশানের চাল গম খেয়ে খেয়ে মাথায় যেটুকু মস্তিষ্ক ছিল তা-ও শালগম হয়ে গেছে। একটা দিন পেরিয়ে গেলেই ভাবি – যাক আজকের দিনটা ভালয় ভালয় পেরিয়ে গেল। যেদিন অন্ন জোটে না বুড়ো আঙুল চুষি। সেদিন আমার নিজস্ব বুড়ো আঙুলটাই বললে, এবার চুষতে হলে ভাড়া দিতে হবে।

সরিষা পিষিয়া আর পাই নাকো তৈল
তেল সব উবে যায় থাকে খাই খৈলো।

।। ৩০ অক্টোবর ১৯৭৫।।

রবীন্দ্রভারতী গেল সরকারের হাতে
মাছের মুড়াটি গেল প্রতুলের পাতে।
বেইরুটে গৃহযুদ্ধে ভারি ধুমধাম।
গরীবের ঘরবাড়ি হবে চুনকাম
বিশ্বের ধনীরাই জোগাবেন টাকা
ঘুরিয়ে দেবেন নাকি ভাগ্যের চাকা
আমেরিকা রাশিয়ার পরমাণু বোম
গর্জন করিয়া কহে তৎসৎ ওঁ!
বিদ্যুৎ ইউনিট না কি হয়েছে বিকল
পাখা নাই, আলো নাই, কলে নাই জল।
সম্মুখেতে কালীপূজা – হইবে তার কি?
সেখানেও ইউনিট দিবে কি ইয়ার্কি?
মৃত মুজিবের গৃহে সোনা প্লাটিনাম
হীরা মুক্তা জহরত – যার বহু দাম
পাওয়া গেছে, আর গেছে লক্ষ লক্ষ টাকা
শ্রীমুজিব ছিলেন না হালকা বা ফাঁকা।
এসব খবর আজ হইয়াছে ছাপা
ছাপা যাহা হয় নাই তাহাও অমাপা।

।। ৩১ অক্টোবর ১৯৭৫।।

আজ হল না লেখা
লেখায় তো মন নেই
বিকেল বেলা যেতে হবে সাহিত্য-তীর্থে
মন রয়েছে সেখানেই।

৩টে নাগাদ এলেন বৃদ্ধ শিক্ষক
শ্রী খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
'কল্যাণীয়াসু' বই দিয়ে হাতে
বললেন পড়ে অভিমত লিখে দিতে হবে
রাজি হলাম তাতে
৪টে নাগাদ যুগল (সেন) এল ফোটোগ্রাফার সাথে
নাতি-নাতিনী সহ তোলা হল ফোটো।
মন বললে – এইবার ওঠো
সভার সময় হল

চন্দ্রা সব কাপড় জামা ঠিক করে দিল।
সভা বেশ জমে ছিল – হল লোড শেডিং
কিন্তু আমরা দমলাম না
জ্বালিয়ে কেরোসিন
চালিয়ে গেলাম সিনের পর সিন
লেখক এবং কবিদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে সবার
শেষ হল সভার।
লোড শেডিং সত্ত্বেও
কবিদের হৃদয়ের লোড শেডিং হল
মনে মনে বললাম – বাঁচা গেল এবার বাড়ি চল।

।। ১ নভেম্বর – ১৯৭৫।।

আবার একটি প্রদীপ নিবল আজ
চলে গেলেন গায়কবর
শচীন্ মহারাজ
গানের রেকর্ড আছে তাঁর অনেক
থাকবেন তিনি বেঁচে
কিন্তু সবুর কর ক্ষণেক
পান্না বাই, শিবনাথ রাও, লালচাঁদ
আরও অনেক গায়ক এবং গায়িকা
সে যুগে তো পেতেছিলেন রেকর্ড ফাঁদ
কটা লোক পড়ল ধরা তাতে
সবাই এখন করছে গাদাগাদি
বস্তা-পচা ইতিহাসের পাতে।
শচীনকেও ভুলে যাব, আমরা শুধু
বর্তমানেই বাঁচি
তারপরই চলতে থাকে
বিস্মৃতির কাঁচি।
তবু আজ বলব নির্ভয়
শচীন দেব বর্মনের জয়।

।। ২ নভেম্বর – ১৯৭৫।।

আজ কালী পূজা।

কালী-প্রতিমা সম্বন্ধে কিছু গবেষণামূলক কল্পনা করা যাক। কালী মেঘবরণী কৃষ্ণাঙ্গী। তার কারণ তিনি অনার্য বঙ্গ বীরাঙ্গনা। সেকালে বঙ্গবাসীরা সব অনার্য ছিল। দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক জাতির সঙ্গে নিগ্রেট ও অস্ট্রালয়েড এবং কিছু মঙ্গোল জাতির সংমিশ্রণে বঙ্গদেশে বাঙালী জাতির উদ্ভব হয়। আর্যেরা মাঝে মাঝে এই অনার্য দেশে এসে হানা দিতেন। লুটপাট করতেন, নারী ধর্ষণ করতেন এবং পালাতেন।

কল্পনা করতে ক্ষতি কি যে এই কালীমাতা সে যুগের জোয়ান অব আর্ক – যিনি পরে সেন্ট জোয়ান হয়েছিলেন। তাঁর বক্ষে হস্তে কানে যে মুণ্ডমালা তা আর্যদের মুণ্ড। তাঁর পদতলে যে শিব তিনি শ্বেতকায় আর্য। তাঁর বাঁদিকের হস্তদ্বয়ে খড়্গ এবং ছিন্নমুণ্ড, কিন্তু দক্ষিণ দিকের হস্তদ্বয়ে অভীতি ও দান – তিনি যেন স্বদেশবাসীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন – ভয় নেই, আমি আছি।

দীপালী অনার্যদের বিজয়োৎসব।

।। ৩ নভেম্বর – ১৯৭৫।।

যদু। [চিন্তিত মুখে] ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনে হামলা হয়েছে। আমাদের চারজন জোয়ান মারা গেছে। শুনেছিস?

হরি। প্রধানমন্ত্রী কিন্তু চুপ করে আছেন।

মধু। মাওসেতুং।

রাম। আমার মনে হয় ওটা মেয়েমানুষ ঘটিত ব্যাপার। মেয়েমানুষ নিয়েই চিরকাল মারামারি হয়।

হরি। রমজান তোর বোনটাকে নিয়ে যখন পালাল – তখন তুই মারামারি করেছিলি?

রাম। কেন করব? ওই দজ্জাল বোনটা ঘাড় থেকে নেবে যাওয়াতে – আমি বাঁচলুম।

যদু। উদীয়মান নাট্যকার নবাই পান্ডে ওই ঘটনাটা নিয়েই বোধহয় 'নিতম্বিনী' নাটকটা লিখেছে। স্টেজ হলে হই হই পড়ে যাবে – sure hit.

[এমন সময় একটা সোরগোল উঠল] পালাও – পালাও – পাগলা মোষটা বেরিয়েছে – দুজন লোক খুন হয়ে গেছে – [সঙ্গে সঙ্গে দুদ্দাড় করে সকলে পালিয়ে গেল। মধু হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, কিন্তু কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাল না]

।। ৪ নভেম্বর – ১৯৭৫।।

<u>প্রধান খবর</u>

বাংলা দেশের হাল: পুনশ্চ বানচাল
খোন্দকার বিতাড়িত
মুশারক বাহাল
জানি না তো কি যে হবে কাল
নেপথ্যেতে অনেকেই শানাচ্ছে তরোয়াল
কেউ কেউ বা জোগাড় করছে ঢাল
শত্রুরা সব নাচছে আজ
তা ধিন্ ধিন্ ধিন্না
গোটা ভারত টুকরো করে
কি কান্ড যে করে গেল জিন্না।

আরও খবর

স্লেশিংগার বরখাস্ত
ভালো আছে ফোর্ডের স্বাস্থ্য
স্প্যানিশরা ভারি ক্রুদ্ধ
শাহারায় হচ্ছে যুদ্ধ।
ভারতে চীনের হামলা।
চিন্তার ঠ্যালা সামলা।
চিন্তা করছে রুশ – খাক্ষ
ভারত-বৃক্ষ।
অনড় কিন্তু।

।। ৫ নভেম্বর – ১৯৭৫।।

আজ শুভ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
ভায়ের কপালে ফোঁটা দিয়া
বোনেরা বলিছে বারবার
সুখী হও, দীর্ঘ হোক জীবন তোমার।
শুভ ও সুন্দর এই সুমিষ্ট পরব
মোদের গরব।
বোনরা স্মরণ করে ভাইদের আজ
ভাইরা পরায় বোনে
নব নব সাজ।
যমরাজ চিন্তিত বেজায়
'সকলেই তাঁর দ্বারে দিতেছে যে কাঁটা
এত কাঁটা সাফ করি
কোথায় পাইব এত ঝাঁটা।
যমুনাও যমকে ফোঁটা দিয়া কয়
তোমার দপ্তর আজ বন্ধ যেন রয়।

পুষ্পবিলাপ

নারায়ণ দাশশর্মা

মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী প্রাসাদ সংলগ্ন প্রাচীন উদ্যানের অপভ্রংশে একটি কামিনী ফুলের গাছ আছে। চিত্রাঙ্কনে পারদর্শিতা থাকলে আমি সেই গাছটির একটি রেখাচিত্র রচনায় প্রয়াসী হতাম। সময়ের ক্ষতচিহ্নে উল্কি আঁকা তার গ্রন্থিল অঙ্গের দিকে তাকিয়ে মনেই হয় না যে এখনও তাতে কিছু ফুল ফোটে, হয়ত-বা কয়েকটি বুলবুলি এবং বউ-কথা-কও এখনও এসে বসে ফুল ঝরে যাওয়া ফলের অন্বেষণে।

সংস্কৃতিবর্জিত বিত্তবত্তা ও শিল্পচেতনা-হীন অনুকরণসর্বস্ব স্থাপত্যের grotesque নিদর্শন এই প্রাসাদটির কোথায়ও হয়ত এর জন্মলগ্নের সালতারিখ লেখা আছে। কিন্তু অট্টালিকাটির বয়স জানার জন্য সেই লিখিত ঠিকুজি দেখে হিসেব করার প্রয়োজন নেই, কামিনী গাছটির মধ্যেই তা স্বতঃ প্রকট।

এই গাছ – যার বৈজ্ঞানিক নাম সম্ভবতঃ murruya exotica ('সম্ভবতঃ' বলার কারণ এই যে নামটি যে জায়গা থেকে টুকেছি তার প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই ঃ এই প্রবন্ধে উল্লেখিত অন্য সব বৈজ্ঞানিক নাম সম্বন্ধেও একই টীকা প্রযোজ্য) – কামিনী নামে আখ্যাত হয়েছিল কেন এবং কবে, তা আমার জানা নেই। যে-যুগে এই গাছ এবং ফুল জনপ্রিয় ছিল সে-যুগে কামিনী শব্দটি ছিল অত্যন্ত আধুনিক ও চটকদার। এর বৈজ্ঞানিক নামের উত্তরপদটি exotica না হয়ে erotica হলে বাংলা নামটির তাৎপর্যের আভাস পাওয়া যেত। প্রায় তমালের (xanthochymus pictorius) মত গাঢ় সবুজ রঙের পাতার মধ্যে অনেকটা দ্রোণপুষ্পের (leucas) মত দেখতে ধবধবে সাদা রঙের অজস্র সুগন্ধ ফুল ফোটে কামিনী গাছে। সব সাদা ফুলের মত কামিনীও নিশাচর। অবশ্য গন্ধ এবং ফোটার সময়ের বিবেচনায় এর নাম কামিনী রাখা হয়ে থাকলে হাসনাহানার (myrtaceae henna) উপর ঘোরতর অবিচার করা হয়েছে বলতে হবে। তবু যে কোন কারণেই হোক হাসনাহানা কামিনী নয়, কামিনীই কামিনী।

এবং এমন কোনো পুরোনো বাগানবাড়ি কিংবা শুধুই বাগানসমেত বাড়ি পাওয়া যাবে না যাতে অন্ততঃ একটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটি, কামিনী গাছ নেই। সেকালে কাঁঠাল গাছ যেমন ছিল বাস্তুভিটার অপরিহার্য প্রতীক, তালগাছ যেমন পুষ্করিণীর, তেমনি কামিনী গাছ ছিল উদ্যানের সামান্য লক্ষণ। আর কামিনী যেহেতু দীর্ঘজীবী, লালবাগের শতবর্ষাতিক্রান্তা বৃদ্ধার মত আরও অনেক ঐতিহাসিক কামিনী নিশ্চয়ই বাংলাদেশের ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, তাই বহু স্থলেই তাকে দেখা যাবে লুপ্ত প্রাচুর্যের একক সাক্ষীর মত, কেমন যেন ট্র্যাজিক।

কামিনী বললেই শব্দানুষঙ্গে মনে পড়ে কাঞ্চনের কথা। জলসাঘরে যদিও এই দুই ক্ষণস্থায়ী (এবং পরস্পর-সাপেক্ষ) বস্তুর আয়ু তুলনীয়, বাগানে কিন্তু কাঞ্চন (bauhinia variagata) কামিনীর ধারে-কাছে আসে না, কী জনপ্রিয়তায় কী টিঁকে থাকায়। সত্যি বলতে কি, কামিনীর তুলনায় কাঞ্চন প্রায় বুনো গাছ, বিলাস-উদ্যানে তার ঠাঁই মিলেছে কদাচিৎ।

কামিনীর বিশ্বজনীনতা এখন ইতিহাস মাত্র। ত্রিশ বছর আগেও বাড়ির চারপাশে ছোট একটি উদ্যান রচনা করতে, এমনকি নিরুদ্যান বাড়িরও দ্বারদেশে, সুদৃশ্য দুটি কামিনী গাছ অপরিহার্য ছিল। আজ সেখানে কেউ লাগাচ্ছেন বিলিতী ঝাউ, কেউ ক্রোটন বা অন্য কোন পাতাবাহার, কেউ-বা বুগনভিলিয়া বা এলামুণ্ডা। শতকে একটি স্থলে কামিনীর প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

শুধু কামিনী নয়, আরও কয়েকটি একদা জনপ্রিয় অধুনা অপাংক্তেয়, অন্ততঃ উপেক্ষিত, গাছ আছে, বাগানে যাদের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব দেখে প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায় বাগানটির পত্তন সেকালে হয়েছে, না একালে।

চম্পক বা কনক চাঁপার (michelia champaca) খ্যাতি তো দেশ-কালের সীমা-পরিপ্লাবী। রোম্যান্টিক শিরোমণি শেলী তাঁর Lines to an Indian Air কবিতায় দূরাগত চম্পক-সুবাসকে আশ্চর্যভাবে জীবন্ত করেছেন "The Champak odours fail/Like sweet thoughts in a dream" পঙ্‌ক্তি দুটিতে। সাতভাই চম্পা থেকে শুরু করে রূপকথার রূপালী স্বপ্নময় কাহিনীগুলো কত কত রাজকন্যা চম্পাবতীর স্পর্শে শিহরিত তার ইয়ত্তা নেই। প্রাচীন বাংলায় চাঁপা একটি ফুল মাত্র নয়, চাঁপা একটি আইডিয়া। Michelia genus-এর বাইরেও অসংখ্য ফুল তাই চাঁপা আখ্যায় আখ্যাত। ভুঁই চাঁপা ও দোলন চাঁপা হলুদ এবং আদার মাসতুতো বোন, কাঁঠাল চাঁপা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আমদানি ক্ষুপ, চম্পকের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কে নেই, চালতা চাঁপাও বিদেশী গাছ – চাঁপার কিংবা চালতা (dillenia speciosa) কারো সঙ্গে তার আত্মীয়তা নেই। এইসব অগণিত মিথ্যা চাঁপার জালিয়াতি থেকেই আদি ও অকৃত্রিম চম্পকের গৌরব অনুমেয়। ঈষৎ সোনালী আভা ঝলকানো চিকন সবুজ রঙের পাতাভরা ঋজু দেহের মন্দিরোপম গঠনে এবং প্রেয়সীর অঙ্গুলি যার একমাত্র উপমা তেমনি কুঁড়ি থেকে ফুটে ওঠা স্বর্ণবর্ণ কোমলস্পর্শ মধু-গন্ধ ফুলে কনকচাঁপা অনন্যা। আজকের বাগান থেকে চম্পক কিন্তু নির্বাসিত।

নিবারণ চক্রবর্তী ছদ্মবেশে রবীন্দ্র-বিরোধী কপট বিদ্রোহের রোম্যান্টিক ভূমিকায় চমক লাগানো কবিতা রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথ মহুয়া কবিতায় বিতর্ক তুলেছিলেন ঃ

"বিরক্ত ভ্রমর মন কিংশুকের এত গর্ব দেখি।/নাহি ভুলিবে কি/অশোকের অতি খ্যাতি, বকুলের মুখর সম্মান।/ম্লান্ত কি হবে না কবিগান/মালতীর মল্লিকার অভ্যর্থনা রচি বারম্বার।/"

প্রথম পঙ্‌ক্তির কিংশুক শব্দটি আমার কেমন যেন কলম-পিছলানো বলে মনে হয়। কিংশুক (butea frondosa) কদাপি উদ্যানের সভাসদ ছিল না, সে নিতান্ত বনপুষ্প; রবীন্দ্রনাথ তার 'এত গর্ব' কোথায় দেখতে পেলেন? সাঁওতাল যুবতীর যৌবন গর্ব কি প্রতিফলিত ছিল তার খোঁপায়? অশোক বকুল মালতী মল্লিকা, কবিতায় উল্লেখিত অন্য চারটি ফুলই উদ্যানের, কিংশুকের সঙ্গে তাদের পঙ্‌ক্তিভোজন চলে না। ওখানে কিংশুক না লিখে চম্পক লিখলে সুষ্ঠু হত। কিন্তু সে কথা প্রাসঙ্গিক নয়, প্রাসঙ্গিক হল রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্যে সাড়ে ছাপ্পান্ন বছর আগে (মহুয়া কবিতাটির রচনাকাল ১৮ ভাদ্র, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) কবি-বন্দিত পুষ্প চতুষ্টয়ের নাম ঃ অশোক, বকুল, মালতী, মল্লিকা।

।। দুই ।।

অশোক (jonosia asoca, saraca indica) কালিদাসের যুগের বিখ্যাত পুষ্প, রবীন্দ্রনাথের যুগে তার জনপ্রিয়তা সম্পূর্ণ অস্তমিত। শুধুমাত্র কাব্যপ্রসিদ্ধির উত্তরাধিকারে তখনও সে বিস্মৃতিলুপ্ত হয়নি। তরাই অঞ্চলের দক্ষিণে বঙ্গদেশের কোথাও অশোক সহজে ফোটে না, যদিও তার ক্ষুদ্রাকৃতি জ্ঞাতি রঙ্গন (ixora coccinea) ভালই ফোটে। উত্তরবঙ্গে অশোকের স্বতঃস্ফূর্তি ও দক্ষিণ বঙ্গে তার স্ফুটন-কার্পণ্য দেখে এক একবার আমার কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ("অশোককুঞ্জ উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে"), দেবেন্দ্রনাথ সেন ("কোন রাঙ্গা চরণ চুম্বনে/মর্মে মর্মে শিহরিয়া হলি লালে লাল") ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ("অনুপূর্ব পথিকার পায়ে/বজ্রাহত অশোকেরে অলজ্জায় করেছি বিনত/ক্ষণিক পুষ্পের লোভে")প্রপাগ্যান্ডায় বিশ্বাস করে ("প্রমদাগণের চরণাঘাতে অশোক পুষ্পের বিকাশ হয় বলিয়া কবি-প্রসিদ্ধি আছে" – বাঙ্গালা ভাষার অভিধান) মনে হয়েছে শান্তিনিকেতনের এধারের তরুণীরা বোধহয় ওধারের কিন্নরীদের মত পদাঘাতে তেমন পটু নন।

কিন্তু অশোকের কথা থাক, কারণ আগেই বলেছি ১৩৩৫ বঙ্গাব্দেও অশোকের 'অতিখ্যাতি' মরণোত্তর কবিখ্যাতি মাত্র, সে আর তখন লোকখ্যাত নয়। কিন্তু বকুল? ষাট বছরের ওধারে পাঠক (ছানি কাটানো বা এড়ানো দুচারজন যদি থাকেন) নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী-ভাগিনেয়ীদের মধ্যে, চল্লিশ থেকে উনষাট বছরের মধ্যেকার পাঠক আপন-তুতো ভগিনীদের মধ্যে (সহপাঠীর সহোদরা ও তুতো included) এবং পঁচিশ থেকে চল্লিশ পর্যায়ের পাঠক পিসী-মাসীদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করুনঃ দু-একটি বকুলের দেখা পাবেন সন্দেহ নেই। নামের জনপ্রিয়তাই ফুলের জনপ্রিয়তা সপ্রমাণ করবে: 'বকুল ফুল' ছিল সে যুগের মেয়েদের একমাত্র ফুলেল সখিসম্পর্ক। কারণ বোধহয় এই যে শুকোলেও বকুলের গন্ধ যায় না।

আর আজ? কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের পাঁচনের দোকানে বকুলের নাম এখনও শোনা যায়, কারণ বকুল ছালের ক্বাথ কুলকুচো করলে নাকি দাঁতের ব্যথা কমে। আর কোথায়ও বকুলের আদর দেখি না। বকুল বাগানে বাগান যদি-বা আছে, বকুল নেই আর।

মালতী (aganosma calisina) এবং মল্লিকা দুটি ফুলই নিকটাত্মীয়, একই genus-এর দুটি species – হয়ত বা একই species-এর দুটি variation মাত্র। বিভিন্ন স্থানে এবং কালে মালতী বলতে জুঁই শ্রেণীর বিভিন্ন ফুলকে বোঝানো হয়েছে এবং মল্লিকা বলতে বেলফুলের একটি উপজাতিকে; কখনও মল্লিকাও জুঁই-এর উপশ্রেণী। বস্তুতঃ জুঁই বা যুথী, চামেলি, মালতী, ইত্যাদি নামে বর্ণিত এবং বেল, বেলী, মল্লিকা ইত্যাদি নামে আখ্যাত ফুলগুলির মধ্যে পার্থক্যের সীমা অস্পষ্ট। এবং এর প্রায় সবগুলোই এখন উদ্যান থেকে নির্বাসিত। যদি বা জেসমিন শ্রেণীর কোন ফুলের ঠাঁই থাকে কৃচিৎ কারো একালের বাগানে, তবে তার বট্যানিক্যাল নাম যাই হোক না কেন বাংলা নাম সাদামাটা জুঁই এবং বেল। মালতী এবং মল্লিকা এখনও যদি মর্ত্যলোকে থেকে থাকেন তবে তাঁরা অন্য নামে আছেন, তেরশো পঁয়ত্রিশ সালী নামে নেই।

ফুল এবং নারী দুয়ের ক্ষেত্রেই কথাটা সমান সত্য। মানবীর নামকরণে মল্লিকা শেষ শোনা গেছে কথা ও কাহিনীর বিসর্জন কবিতায়, রচনাকাল ১৩০৬, আর মালতী-ইনি অতটা archaic নন কেননা আমার সমবয়সী জনা তিনেক মালতীর কথা মনে পড়ছে – বোধহয় সর্বশেষ কাব্যার্ঘ্য পেয়েছেন (যতদূর মনে পড়ে) বুদ্ধদেব বসুর একটি উপন্যাসে (নির্জন স্বাক্ষর?) এবং অজিত দত্তের 'মালতী, তোমার মনে রাখিয়াছি আমার স্বাক্ষর'-এ। বুদ্ধদেব (জন্ম ১৯০৮) এবং অজিত (জন্ম ১৯০৭) সমবয়সী এবং বহুদিনের প্রতিবেশী। কাকতালীয়তা অতএব স্বাভাবিক। স্বাক্ষর সমেত।

।। তিন ।।

আর কী ফুল ছিল সেকালের ফ্যাশান-দুরস্ত? রবীন্দ্ররচনাবলীর পৃষ্ঠায় ইতস্তত দৃষ্টিপাত করে যে-সব ফুলের উল্লেখ পাচ্ছি তার মধ্যে এখনও আলোচিত হয়নি কদম, কেয়া, শিউলি বা শেফালি, করবী, রজনীগন্ধা, সেঁউতি, গোলাপ। শাল মঞ্জরী বা আম্র মুকুলকে আমি ফুলের পর্যায়ে ধরিনি। কুড়চি বা কুরচি এবং নাগকেশরকেও বাদ দেওয়া যায় কারণ এদের উল্লেখ একটি দুটি আকস্মিক স্থলে। কদম (anthocephalus cadamba) উদ্যানের ফুল নয়, বনের। আদ্যে শ্রীকৃষ্ণ, মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্তে অচিন্ত্যবাবু কদমকে রোম্যান্টিক ফ্রেমে বাঁধিয়েছেন, না হলে কদমফুলী চুলের ছাঁট এবং কদমা ক্ষীরকদম রসকদম ইত্যাদি মন্ডাতেই কেবল কদমের উপমা পাওয়া যেত। কেয়া বা কেতকীও (pandanus odoratissimus) অযত্নে জাত বন্যগুল্ম। সেকালে বাঙালীর তাম্বূলবিলাসে এবং উত্তরভারতের কেওড়ার জলে এর শীতল সুবাস আদৃত ছিল; কিন্তু শুধু ফুল হিসাবে কেয়া কোনদিনই স্বীকৃতি পায়নি। নামকরণে কেয়া তথা কেতকীর বাজার একদা খুবই ভাল ছিল; এখনও মোটামুটি, তার প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত। মহুয়ার একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নায়ককে দিয়ে কদম ফুল উপহার দিইয়েছিলেন এবং প্রতিশোধ হিসাবে নায়িকাকে দিয়ে কাঁটা সমেত কেয়াফুল। আমার ধারণা, ওই কবিতাটি লেখা না হলে গড়িয়াহাট বাজারের ফুলের দোকানে বর্ষাকালে কদম এবং কেয়া বিক্রী হওয়ার কোন যুক্তি ছিল না।

এইসব ঝোপঝাড়ের ফুল বাদ দিয়ে আর যা থাকল, তার মধ্যে গোলাপের জনপ্রিয়তা শতাব্দী পেরিয়েও অক্ষুণ্ণ। হান্ড্রেড আমৃটিন নট আউট। কিন্তু হিন্দুস্থানে গোলাপের প্রচলন যত প্রাচীন (নূরজাহানের বিখ্যাত তসবীরে তিনি গোলাপধারিণী), বাংলায় তত নয়। শূন্যপুরাণে গোলাপের উল্লেখ নেই, 'কুন্দ (jasminum multiflorum) কুড়চি (echites antidysenterica) ফুল তুলিল দুলাল টগর (tabernaemontana coronaria)' আছে। রাধারাণী নামে দশ এগারো বছর বয়সী বঙ্কিমবাবুর নায়িকাটি (বয়স ঔপন্যাসিকের নয়, নায়িকার) মাহেশের রথে কলার পরিবর্তে যে-ফুল বেচতে গিয়েছিল তাও গোলাপ নয়, মালা গাঁথার যোগ্য বনফুল। বস্তুত সেকালের বাংলাদেশে ফুলের ব্যবহার প্রথমে মালাগাঁথায়, তারপর "কেহ দেয় দেবতা-চরণে...... কেহ বঁধুর গলায়।" মালা-গাঁথা কালচারে ম্যাগনোলিয়া সূর্যমুখী গোলাপ প্রত্যেকেই সমান খাপছাড়া, ওগুলো সব তোড়া বাঁধা ফুলদানি এবং জামার বোতামে আঁটা কালচারের ফুল। (সূর্যমুখী-সজ্জিত buttonhole অসকার ওয়াইল্ডের মৌলিক উদ্ভাবনা।) বাংলা নামকরণে সবরকম ফুলের নাম অজস্র, এমনকি লিলি ডালিয়া ক্যামেলিয়া প্যানজির মত বিজাতীয় নামও অপাংক্তেয় নয়, গোলাপ কিন্তু বিরল। কালচারগর্বে উন্নাসিক সমাজেই মাত্র একথা সত্য নয়, যাদের মধ্যে টগর এখনও অন্তত ডাকনাম হিসাবে প্রিয় এবং পারুল (bignonia suaveolens) এখনও পোশাকী নাম, সেই প্রাকৃতজন গোষ্ঠীতেও গোলাপ নামের বালিকা বা বৃদ্ধা অতীব বিরল। বাংলা কাব্যে গোলাপের মত জনপ্রিয় ফুলের উপস্থিতি জনপ্রিয়তার তুলনায় অনেক কম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ও গানে যে কবার

গোলাপকে স্মরণ করেছেন 'বাল্যকালের লেখার উপর ......বিশেষ মায়া থাকে' বলে যে গ্রন্থে 'এমন অনেক কবিতা ছাপা হইয়া থাকিবে যাহা ঠিক প্রকাশের যোগ্য নহে' সেই শৈশব সংগীতের অন্তর্গত 'গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে' এবং 'বলি, ও আমার গোলাপ বালা,' ইত্যাদির দায় থেকে কবিকে অব্যাহতি দিলে সম্ভবত ১৩০২ সালে রচিত চিত্রা গ্রন্থান্তর্গত সান্ত্বনা কবিতায়ই গোলাপের প্রথম সার্থক উল্লেখ ঃ('একটি গোলাপফুল রেখেছি বক্ষের মাঝে,/তব ঘ্রাণশেষে/আমারে ফিরায়ে দিলে অধরে পরশি তাহা/পরি লব কেশে ') যূথী এবং মালতীর উল্লেখ করেছেন হয়ত তার একশো গুণেরও বেশি বার। (এক্ষেত্রেও শৈশব-সংগীতের অশোকমালতী ও বকুলের বিষমবাহু ত্রিভুজের কাহিনী না ধরলে ১২৯০ সালে প্রকাশিত প্রভাতসংগীত গ্রন্থের প্রভাত-উৎসব কবিতায় 'যূথীর মৃদুশ্বাস মালতীমৃদুবাস' থেকে শুরু।) গোলাপ এখনও ড্রয়িং রুমের ফুল, অন্তঃপুরের নয়।

সেঁউতি, সংস্কৃত নাম সেবন্তী বা সেবন্তিকা (rosa moschata) এখনও দু-একটি বাগানে দেখা যায় – তবে ফুলগাছ হিসেবে নয়, কাঁটাওলা বেড়ার গাছ হিসেবে। গোলাপেরই দীন উপজাতি, প্রায় নির্গন্ধ সাদা রঙের এক সারি পাপড়ির এই সাদামাটা ফুল ঝরে গেলে ছোট ছোট গাঢ় লাল রঙের ফল ধরে গাছে। রবি ঠাকুরের দাক্ষিণ্যে অনেক রামাশ্যামার মত সেঁউতিও উতরে গেছে। কিন্তু কালোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

রজনীগন্ধা (polianthes tuberosa) বোধকরি একমাত্র সেকালের ফুল যার কদর একালে শুধু কমেনি বললে ঠিক হবে না, বেড়েছে। শুধু কদর নয়, দরও। বিয়ের মরশুমে রজনীগন্ধার গোড়ে মালা এক জোড়ার দাম পঁচিশ ত্রিশ টাকা পর্যন্তও ওঠে নাকি কখনও কখনও। পঁচিশে বৈশাখের জন্মদিন যদি বিয়ের সঙ্গে জোড়ে এসে পড়ে তবে এক ডজন স্টিক দশ বারো টাকায় বিকোয়।

তবে গ্ল্যাডিওলার সঙ্গে রজনীগন্ধার প্রতিযোগিতা এই তো মোটে শুরু হয়েছে বছর পাঁচেক হল। আর কয়েক বছর যাক, পাঁশকুড়া-মেচেদার ফুলচাষীরা ঠিক করবেন রজনীগন্ধা শেষ পর্যন্ত টিঁকবে, না সেঁউতি-কাঞ্চন-করবিকার সঙ্গে সহমরণে যাবে।

।। সাড়ে তিন ।।

রজনীগন্ধার একমাত্র ব্যতিক্রম বাদে তাহলে দেখতে পাচ্ছি সেকালের ফুলেরা—পঁচিশ বছর আগেও যাদের বাগানে বাগানে দেখা যেত—ক্রমে ক্রমে অনাদৃত, নির্বাসিত, বিস্মৃত হচ্ছে। গন্ধরাজ দেখা যায় কটি উদ্যানে? কোন কুঞ্জে কুন্দ ফোটে আর? কার উপবনে আজ বনজোৎস্নী কুসুম প্রসব করে? কালিদাসের কালে যার নাম ছিল কুরুবক, সে না হয় সাদামাটা ঝিন্টি ফুল নামেই ফুটত আজকের বাগানে, শ্বেত-রক্ত-নীল-পীত নানা বর্ণে উজ্জ্বল হয়ে। প্রিয়ার অধরের সঙ্গে ছিল যার উপমা সেই বন্ধুক পুষ্প বাঁধুলি নামে, এমনকি প্রাকৃততর দুপুরে চন্ডী নামেই না হয় অঙ্গনপ্রান্তে ফুটে থাকত। সন্ধ্যামণি এক প্রহরের ফুল সন্দেহ নেই, কিন্তু আধ প্রহরের পর্টুলাকার ঠাঁই করতে তাকে কেন নির্বাসন দিলাম?

বৃথা এই পুষ্পবিলাপ, জানি। ঝড় হয়ে গেছে কাল রজনীতে রজনীগন্ধা বনে। কাল যদি না হয়ে থাকে আগামীকাল হবে, কে না জানে এ কথা। এখন এল অন্য সুরে অন্য গানের পালা, এখন গাঁথো অন্য ফুলে অন্য ছাঁদের মালা। অন্য ফুলের তো কমতি নেই আজও। জবা না থাকে আছে হিবিস্কাস। করবী যদি গেছে তো অ্যাস্টার এসেছে কত রঙে রঙ করা। শিউলির বদলে এসেছে জিপসি, শারদপ্রাতে আঁচল বিছানো লেডী লেস। এসেছে ক্রিসেনথিমাম ম্যাগনোলিয়া, এসেছে পপি ফ্লকস কর্ণফ্লাওয়ার ক্যালেন্ডুলা। প্রিমরোজ ডাফোডিল হায়াসিন্থ ব্লুবেল এসেছে সাগরপারের স্টারলিঙ ব্ল্যাকবার্ড থ্রাশের দেশ থেকে। যত চাও তত লও তরণী পরে। ফুল নাও ধনুক নাও সব নাও।

অচেনা সব ফুলগুলো সরিয়ে নাও, আমার লাগছে। শুধু একটা থাক, অন্য ছাঁদের এই মালাটা। এই ফুলগুলো যে আমি চিনি, আমার শৈশবস্মৃতি জড়িয়ে আছে দুধের মত কড়ির মত শাঁখের মত সাদা এই শালুক ফুল কটিতে, কামিনী আর আশশ্যাওড়ার সবুজ পাতায় গাঁথা। □

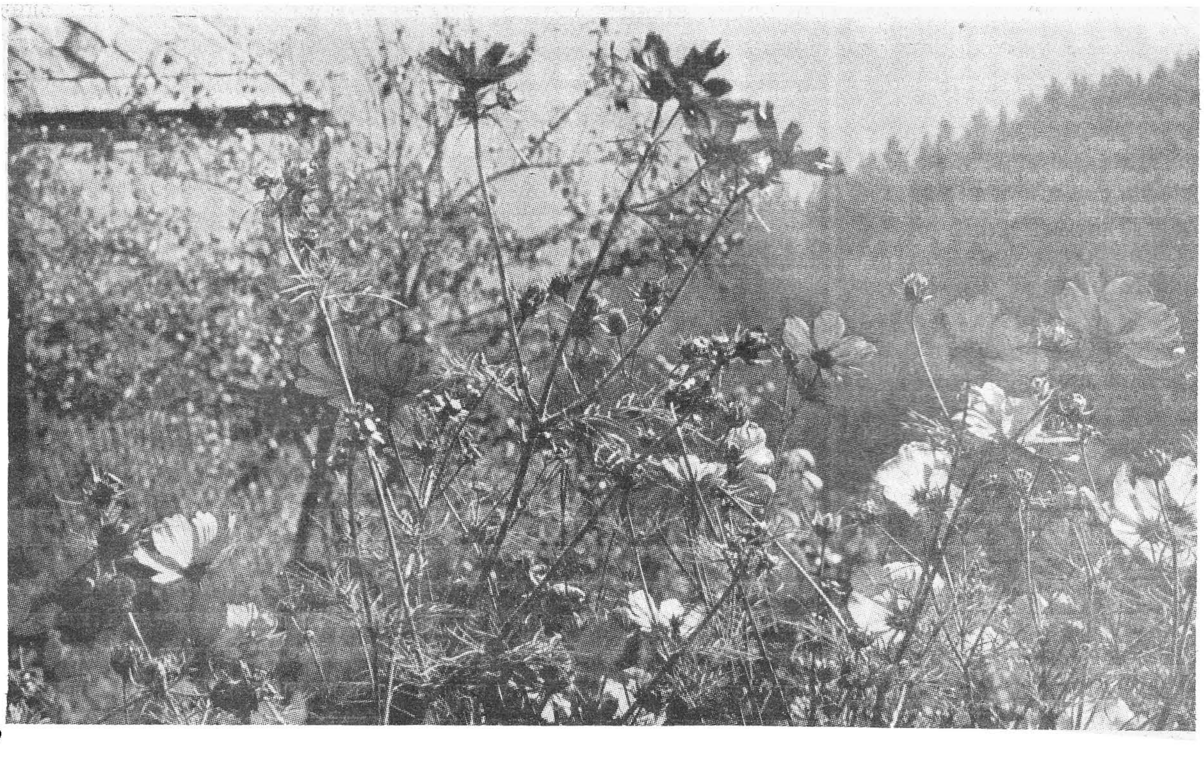

আজকের বিধান সভার অতীতের স্মরণীয় বিতর্ক

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অতীতের পৃষ্ঠা উল্টে দেখলে বহু স্মরণীয় বিতর্ক মুলতুবী প্রস্তাব দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব ও প্রশ্ন-উত্তরের পালা দেখা যাবে। আজকের বিধানসভার অতীতের পৃষ্ঠায় ড্ঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি শের-ই-বঙ্গাল ফজলুল হক, বাংলার বিতর্কিত প্রধান মন্ত্রী এইচ এস সুরাবর্দী, শরৎ চন্দ্র বসু, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু বক্তব্য ও প্রশ্ন উত্তর আলোচনার বক্তব্য দেখলেই অতীতের পরিষদীয় আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি দেখা যাবে। আজকের বিধানসভার মাননীয় সদস্যারা অতীতের পৃষ্ঠা ঘাঁটলে দেখবেন সরকারি বিল, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের পূর্বতন মাননীয় সদস্যদের বাচনভঙ্গী ও আলোচনার উজ্জ্বলতর দিকগুলো।

১৯৩৮ সালের ৯ আগস্ট। তখনকার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিরোধী সদস্যরা কিভাবে শের-ই-বঙ্গাল তথা তৎকালিন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে ছিলেন। কিছু স্কুল ম্যানেজিং কমিটির বিলম্বে অনুমোদনের প্রশ্নকে সামনে রেখে বিরোধী সদস্য ড্ঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেদিন সভায় বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলেছিলেন।

সেদিনকার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এই আলোচনায় পূর্ব বিবরণী একটু তুলে ধরছি

৯ আগস্ট ১৯৩৮

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি বিদ্যালয়গুলির সংবিধান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত এ বিষয়ে তিনি জ্ঞাত আছেন কিনা?

ফজলুল হক ঃ আমি এ বিষয়ে স্হির নিশ্চিত নই, তবে আমার মনে হয় এটাই হয়ে থাকে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিঃ মাননয়ী মন্ত্রী জানেন কি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিয়ম মত বিদ্যালয়গুলির নির্বাচিত কমিটিকে জেলা শাসকের অনুমোদন পেতে হয়?

স্পীকারঃ এই প্রশ্ন ওঠে না।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিঃ হ্যাঁ। ওঠে। মহাশয়, এবিষয়ে পরিস্কার হওয়া দরকার এখানে দ্বিমুখী নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা। মাননীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে বলেছেন আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত নই।'

স্পীকার ঃ আপনি যদি অতিরিক্ত প্রশ্ন তুলতে চা, আপনাকে এ বিষয়টি অন্যভাবে রাখতে হবে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ঃ আমি জানতে চাই বাংলার শিক্ষা সংক্রান্ত আইনমত স্কুলের নির্বাচিত কমিটিগুলির জেলাশাসকের অনুমোদন লাগে কিনা?

ফজলুলহক ঃ না মহাশয়।

স্পীকারঃ আপনি যদি মূল প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে থাকেন মনে করেন তবে একই বিষয়ে অতিরিক্ত প্রশ্ন করতে পারেন না।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ঃ আমি এ বিষয়ে আসতে চাই। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবিষয়ে জানেন কি জেলাশাসকেরা ৬ থেকে ৮ মাস এমন কি ১ থেকে ২ বছর পর্যন্ত সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলগুলির কমিটির সংবিধান নিয়ে আলোচনায় বসেন?

ফজলুল হকঃ আমি কখনও জেলা শাসক ছিলাম না। আমি এ বিষয়ে জানি না।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিঃ মাননীয় মন্ত্রী জানেন কি এর ফলে বিশেষ কিছু স্কুলে সরকারি সাহায্য দীর্ঘ দিন ধরে আটক হয়ে আছে।

ফজলুল হকঃ হ্যাঁ, কিছু ক্ষেত্রে এটা হয়েছে তবে এর পেছনে কারণ কি আমি জানি না।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিঃ মাননীয় মন্ত্রী কি এ বিষয়ে জ্ঞাত আছে, সরকারের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে বহু দরবার করেছেন যাতে সরকার এ বিষয়ে দৃষ্টি দেন।

ফজলুল হকঃ এ বিষয়ে পরস্পরবিরোধী অভিযোগ আছে – শিক্ষা দপ্তর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দু তরফেই।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিঃ আমার প্রশ্নের সঙ্গে পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলায় মাননীয় মন্ত্রীর কথার কোন যোগসূত্র নেই।

ফজলুল হকঃ আমারও নেই।

বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন ঃ মাননীয় মন্ত্রী আমাদের বলুন তাঁর প্রদত্ত সি ও ডি প্রশ্নের উত্তরে আপনি জানান এগুলো শিক্ষার সঙ্গে যোগসূত্রহীন কিনা এবং এর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হল কিনা?

ফজলুল হকঃ শিক্ষার সঙ্গে যোগসূত্রহীন সেগুলিই যার সঙ্গে শিক্ষার কোন যোগসূত্র নেই।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী কি জানেন, ১৯৩০ সাল থেকে যখন মাননীয় খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন তখন থেকেই জেলা শাসকদের অনুমতি নেওয়ার রেওয়াজ হয়েছে, এর আগেএটা ডিপার্টমেণ্ট অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসনের আওতায় ছিল।

ফজলুল হকঃ আমি এ বিষয়ে জানি না।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী কি সদিচ্ছা সহকারে এটা দেখবেন যাতে ১৯৩০ সালের আগে শিক্ষা দপ্তর যে অধিকার পেয়ে আসতেন তা তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

ফজলুল হক ঃ আমি এ বিষয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখছি না যা অনুসন্ধানের প্রয়োজন হতে পারে। যদি এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় আমি তা দেখবো।

বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন ঃ মাননয়ী মন্ত্রীর কাছে রাখা প্রশ্নের উত্তরে আমরা তার পূর্ণাঙ্গ উত্তর পেলাম কিনা মাননয়ী মন্ত্রী কি এ বিষয়ে কিছুবলবেন।

স্পীকার ঃ এই প্রশ্ন ওঠে না...... এরপর স্পীকার দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর আলোচনার ইতি টানলেন।

১৯৪৩ সালের, ১৭ আগস্ট সরকারি বিলের অগণতান্ত্রিক ধারার তীব্র বিরোধিতা করলেন ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী পক্ষের বক্তব্য তুলে ধরে তিনি বললেনঃ

১৯৪৩ সালের ১৭ আগস্ট সরকারি বিলের অগণতান্ত্রিক ধারার বিরোধিতা করলেন ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি। তিনি বললেনঃ 'মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার প্রথম বলবার কথা এই যে দিবেঙ্গল ডেন্টাল বোর্ড গঠিত হলে – এই বেঙ্গল ডেনটিস্ট এ্যাক্ট-এ এই নিয়ম করা হয়েছে যে যাঁরা এর সভ্য হবেন কিম্বা সভাপতি হবেন, তাঁদের ৫ বছরের জন্য গভর্ণমেণ্ট মনোনীত করবেন। এ সম্বন্ধে প্রথমত আমি এই কথা বলবো যে আমরা বর্তমানে গণতান্ত্রিক যুগে বাস করছি। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনয়ন গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং যতটা সম্ভব আমাদের মনোনয়ন প্রথা বন্ধ করে দিতে হবে। তবে কতকগুলি অবস্থায় বাধ্য হয়ে মনোনয়ন প্রথা রাখতে হয় যেমন কোন একটি নতুন বোর্ড গঠিত হলে নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা থাকে না সেই মত কিছুদিনের জন্য মনোনয়ন প্রথার অনুসরণ করতে হয় কিন্তু সেই মনোনয়ন মাত্র তত দিনের জন্যই প্রয়োজন যত দিন যারা নির্বাচিত করবে সেই নির্বাচক মন্ডলী গঠিত না হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি যে দুবছরের ভেতর এত অধিক সংখ্যক নির্বাচক মন্ডলী হবে এবং ডেন্টিস্ট ও রেজিস্টার্ড এত হবে যে ৫ বছর পর্যন্ত মনোনয়ন ধরে রাখা ঠিক হবে না। তাছাড়া ৫ বছরের জন্য এই রকম একটা

'বড়ি' ধরে রাখা যুগপরিপন্থী। সেজন্য হাউসকে ও মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি যে ৫ বছরের জন্য ২ বছর যেন মেনে নেন।

সেদিন সমগ্র বিরোধী করতালি দিয়ে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দিত করেছিলেন।

এরপর আসা যাক ১৯৪৪ সালের ১৯ মে মুলতুবী প্রস্তাব উঠেছিল ঢাকা শহরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষয়ে। সেদিন সভায় এই নিয়ে তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক হয়েছিল। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এক সুদক্ষ বক্তা ও পার্লামেণ্টারিয়ান-এর বিরোধী সদস্য।

হরিপদবাবু সেদিন এক স্মরণীয় বক্তৃতা দেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন –

১৯ মে/১৯৪৪ মুলতুবী প্রস্তাব

বিষয়ঃ ঢাকা শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বিধানসভায় এ নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক হয়ে গেল। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন সুদক্ষ বক্তা ও পার্লামেণ্টারিয়ান ও বিরোধী সদস্য।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় সভায় বললেনঃ 'কত অত্যাচার, কত হত্যার নির্মম কাহিনী, কত পুলিসি জুলুম চাপা থেকে যায়, কিন্তু হিন্দু মুসলমানে সামান্য দাঙ্গা হতে না হতে রয়টার তা পৃথিবীময় ঘোষণা করে দেয়। অমাদের এক বন্ধু যুদ্ধের পূর্বে চীন ও জাপানে ছিলেন। তিনি তখন দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষের পুঞ্জীভূত বহু দুঃখের ও অসংখ্যা সরকারি অত্যাচারের একটি কথাও সেখানে প্রকাশ পেত না, কিন্তু হিন্দু মুসলমানে সামান্য একটা কলহ ঘটতে না ঘটতেই রয়টার সেটাকে ফলাও করে সে দেশে ঘোষণা করতো। আর ঐ সব খবর পড়ে সে দেশের লোক অবাক হয়ে যেত, আর বলতো তোমাদের দেশের রাজনৈতিক বুদ্ধি একেবারেই নাই? ধর্ম নিয়ে তারা এই রকম মাথা কাটাকাটি করে কেন? ও সব দেশে সাম্প্রদায়িক কলহের কথায় লোকের অবাক হওয়াই স্বাভাবিক ঘটনা। সেখানে তৃতীয় পক্ষ নাই, তৃতীয় পক্ষ যতক্ষণ এদেশ থেকে না যাচ্ছে ততক্ষণ আমাদের সাম্প্রদায়িক কলহ মিটছে না। সাধু গান্ধিজী একথা ভাল করেই বুঝেছেন। তাই কুইট ইণ্ডিয়া আজ তাঁর স্লোগান।.....'

তাঁর মতেঃ 'ভারতের পরাধীনতা পৃথিবীর কলঙ্ক। সমস্ত পৃথিবীটাকেই প্রায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জ্বালাতন করছেন। বহু দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছেন এবং তাদের সর্বস্ব হরণ করেছেন এবং এ কাজ তাঁরা করতে পারতেন না যদি ভারতের অর্থ ও সামর্থ্য আগে হতেই করায়ত্ত্ব করতে না পারতেন, তাই পরাধীন ভারতের পাপের সীমা নেই। এ পাপের দায়িত্ব হিন্দু মুসলমান ভারতবাসী মাত্রেই।

সবশেষে ঢাকা দাঙ্গার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেছিলেন, 'খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন ঢাকায় গিয়েছেন, ভালকথা। চলুন আমরা সকলেও ঢাকায় যাই। ঢাকার এই দাঙ্গা আমাদের সকলকেই ধিক্কার দিচ্ছে। আজ শরৎচন্দ্র বন্দী, সুভাষচন্দ্র দেশে নেই, তার উপর দেশের যারা রত্ন তাদের আমরা কারাগারে পুরে রেখেছি, সকল শুভ কাজের যারা নাকি পুরোভাগে থাকে, তারা আজ কেউ নেই, আর আমরা আস্ফালন করছি যে কলকাতা কর্পোরেশনে সাম্প্রদায়িকতা এসেছে তো কি হয়েছে!! কেউ তো এর প্রতিবাদকরছে না, সবাই এটাকে মেনে নিয়েছে। শিক্ষার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাও তেমনি মেনে নেবে। বৃটিশ বেয়োনেট আমাদের রক্ষা করছে আর আমরা যা খুশী তাই করছি। আমাদের চমৎকার-শাসন ব্যবস্থায় দেশের ছাঁকা শ্রেষ্ঠ লোকগুলি কারান্তরালে তিলে তিলে মরছে, আর আমরা এখানে অতি জঘন্য সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে দেশের আবহাওয়ায় কলুষিত করছি, সাম্প্রদায়িতার বিষ ছড়াচ্ছি।.....

বিধানসভার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের অতীতের পৃষ্ঠা দেখলে ঢাকা দাঙ্গা প্রসঙ্গে এই দিনের বিতর্ক এক স্মরণীয় ঘটনা ছিল। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের এই ভাষণও ছিল ঐতিহাসিক।

১৯৩৯ সালের ২৭ জুন সরকারি বিলের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শরৎচন্দ্র বসু এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। এই বক্তব্যের একাংশ হলঃ

'মিঃ স্পীকার 'মানি লেণ্ডার বিলের' সর্বশেষ আলোচনায় আমি আমার পূর্ববর্তী বক্তার সঙ্গে একমত যে, এই বিলে কিছু রেহাই দেওয়ার চিন্তা করা উচিত বলে আমরা মনে করি। পূববর্তী বক্তার সঙ্গে অনেক ব্যাপারে একমত হওয়া সত্ত্বেও তাদের দল এবং আমি একটি মূল প্রশ্নে বিরোধিতা করি আর তা হল এক ব্যাঙ্ক-এর সঙ্গে অন্য ব্যাঙ্ক বা একটি ঋণদান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক বৈষম্য থাকা উচিত কিনা – যেটা সম্ভবতঃ আমি মেনে নিতে পারি না।

স্যার, আমি এ প্রসঙ্গে খুব দীর্ঘ বক্তব্য রাখতে চাই না। আমি এবং আমার দল তার এই বিলের ব্যাপারে সহযোগিতার মনোভাব গ্রহণ করেছি। আমরা এই বিলের কিছু কিছু ধারাকে সাদরে গ্রহণ করেছি কিন্তু কয়েক জায়গায় আমরা সমালোচনাও করেছি। আমি এই বিলের সমালোচনা যা করেছি তার বিশদ আলোচনা এখন করতে চাই না। যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব এই সভার সামনে আমরা রেখেছি তার থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার লক্ষ্য করা যায় যে, ঐ সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাবের প্রকৃতি কি এবং এর উদ্দেশ্য অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শ্রী এইচ এস সুরাবর্দী ছিলেন একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। সুরাবর্দি সাহেবের বাগ্মিতা ছিলেন অসাধারণ। অবিচল দৃঢ়তা ছিল তাঁর বক্তব্যে। বিরোধী পক্ষে বাধা দান, হৈ চৈ কে সুনিপুণভাবে মোকাবিলা করার তাঁর ছিল অসীম ক্ষমতা।

২১ মার্চ, ১৯৪৭। দেশ ভাগের অল্প কিছুদিন আগের ঘটনা। পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে যাঁদের অবদান সুরাবর্দী সাহেব ছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্য ব্যক্তি। সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে সেদিন ব্যবস্থাপক সভায় এইচ এস সুরাবর্দী দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। এই ভাষণ যেমন ছিল ঐতিহাসিক ও বিতর্কিত, তেমনি তাঁর বিরোধী সদস্যদের তীক্ষ্ম বাক্যবাণ ও বাধাদানও ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেদিন সভায় যা ঘটেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরছিঃ

সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রশ্নে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এইচ এস সুরাবর্দী বক্তব্য রাখতে উঠে বললেনঃ

'আমার মাননীয় সদস্যদের অনেক দূর এগিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি না যে সবক্ষেত্রে আলোচনার প্রয়োজন আছে। কেননা এই অধিবেশন চালাকালীন সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমার মাননীয় সদস্যগণ যে সব বিষয় আমার কাছে উপস্থাপন করেছেন, আমি সেই সব বিষয়ে আলোকপাত করব। আমার মনে হয় যে, পাকিস্তান জন্মের সময়ই তার ওপর কাদা ছুঁড়ে বলা হয়েছে যে পাকিস্তান গঠিত হলে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুগণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবেন ও হিন্দু মহিলাদের ওপর নেমে আসবে অসম্মানের বোঝা। পাকিস্তানের জন্মের পূর্বেই পাকিস্তান সম্পর্কে এমন ধারণা করা উচিত নয়, কেননা আমাদের এই সভ্য দেশে সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা সম্পর্কে আর কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। যদি স্বাধীন পাকিস্তান গঠিত হয় তবে আমরা আমাদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারবো।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়ঃ আপনি করবেন না। আগে নোয়াখালি ও ঢাকার ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

সুরাবর্দীঃ আমার মাননীয় সদস্য বিহারের হত্যালীলার ওপর নাচানাচি চিৎকার করছেন না। মীরাটের অত্যাচারের কথাও কি তিনি

বিস্মৃত হয়েছেন?

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়ঃ আগে বলুন আপনি নোয়াখালির ঘটনাকে ধিক্কার জানাচ্ছেন না কেন?

সুরাবর্দীঃ মাননীয় সদস্য কি গড়মুক্তেশ্বর, এলাহাবাদ ও বেনারস প্রভৃতি স্থানের কথা ভুলে গেছেন? আপনারা আত্মানুসন্ধান করুন (প্রবল চীৎকার) (বিরোধীপক্ষ থেকে – আপনি নিজে নিজের আত্মানুসন্ধান করুন) উক্ত স্থানগুলি কোনমতেই পাকিস্তা-নের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জিঃ এইসব ঘটনার আগেই নোয়াখালির ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল।

সুরাবর্দীঃ আপনাদের লজ্জায় মুখ ঢাকা উচিত (প্রবল গণ্ডগোল) আমাদের এখন পরস্পরের প্রতি কাদা না ছুঁড়ে দেশবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত।

ডঃ ব্যানার্জিঃ আমরা তা জানি। আপনি নিজের বিবেকের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

সুরাবর্দীঃ আমি মনে করি না মুসলিম অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগের উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। (শ্রী গণেন্দ্র ভট্টাচার্য অনুপস্থিত) আমি সম্মান হানিকর ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। আমি বলতে চাই যে এই সভায় আমার বন্ধুরা যে ধর্মান্ধতার নজির রাখলেন তা এই সভার পক্ষে অশোভন। এই প্রসঙ্গে ঐ সব অফিসাররা কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করছেন। (ডঃ সুরেশ ব্যানার্জি – ডাহা মিথ্যা কথা – একদম সত্য নয়) আমার মনে হয় হিন্দুদের মুসলিম অফিসারদেরও সম্পর্কে সন্দেহ আছে। সন্দেহের মধ্যে দিয়ে আমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেই বলছি এখনকার সন্দেহ কত বেশি তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আমার কাছে ১৯৪২ সালের বন্দীদের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে বন্দীদের মুক্ত করা হয়েছিল এবং ওয়ারেন্ট বাতিল হয়েছিল। এই ঘটনা একটা ছোট নোটের মাধ্যমে জনগণকে জানানো হয়েছিল। অবশ্য আমরা কোন সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ঐসব অফিসারদের প্রতি হিংসার কথা প্রকাশ করিনি। আমরা আমাদের শাসনের অধিকার প্রয়োগ করিনি। ঐ হিংসার ঘটনা কিন্তু সহজে ক্ষমার যোগ্য নয়। আমি জানি যে আমার বিরোধী সদস্যগণের অনেকেই কিন্তু ১৯৪২-এর স্বাধীনতা আন্দোলন অস্বীকার করেছিলেন। তাঁদের এখন প্রচুর সহানুভূতি দেখানো উচিৎ। আমি জানি তাঁরা অস্বীকৃত হবেন এবং আমি মনে করি না ১৯৪২-এর স্বাধীনতা আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতার প্রশ্নে সর্বাংশে সফল।

এখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঐসব অফিসারদের প্রসঙ্গে আসা যাক। আমি সদস্যদের জানাতে দ্বিধা বোধ করছি না যে এই সভার সম্মান ও স্বাধীনতা কোন ভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। আমি অফিসারদের ভেতরের মতবাদ সম্পর্কে অবগত নই, তবে আমার মনে হয় তাঁরা তাঁদের অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে সম পর্যায়ে দেখতে চান, তাঁরা সকলেই বাংলার সরকারি কর্মচারী, আমার এখন বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ নেই কেন না আমরা শীঘ্রই এই সভায় সরকারি অফিসারদের ভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করব।

শ্রীজ্যোতি বসু এখুনি জনৈক অফিসার সম্পর্কে উত্তেজিত বক্তব্য রাখলেন। আমি তাঁর অভিযোগ সম্পর্কে সহানুভূতির সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। কিন্তু যে কঠোর মন্তব্য তিনি করেছেন তা যদি আমার বক্তব্যকেও কঠোর করে তাহলে তা অনুচিত হবে না। তবু আমি সংসদীয় রীতিনীতি মেনে মাননীয় সদস্যের বক্তব্যের বিষয়ে আলোচনা করব। আমি এই সভাকে জানাতে চাই যে আমার নীতি হল সমস্ত সম্মানীয় সদস্যদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া। আমি বলব আমার মাননীয় সদস্য যথাযথভাবে এই সভায় আলোচনার জন্য তাঁর বক্তব্য পেশ করুন।.....'

এদিনের সভায় উত্তেজনা চরমে উঠেছিল। এত গেল পরাধীনতার যুগের কথা। দেশ স্বাধীন হবার পরও বহু স্মরণীয় বিতর্ক ও ঘটনাবলীর সাক্ষী হল আজকের বিধানসভা। ১৯৬৭ সাল। রাজ্য মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি, বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই, পি এস পি, এস এস পি, লোকসেবক সংঘ, গোর্খালীগ, আর সি পি আই, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, প্রভৃতি সমন্বয়ে প্রথম কংগ্রেস বিরোধী যুক্তফ্রন্ট সরকার অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন হলেন। বিরোধী পক্ষ কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ১২৭। আর তাঁদের নেতা খগেন দাশগুপ্ত। ১৯৬৭ সালের ৩০ জুনের কথা। সিদ্ধার্থ শংকর রায় তখন বিরোধী কংগ্রেস দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। প্রথম যুক্তফ্রন্টের অর্থমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পাশ করা বাজেটের সমালোচনা করে সিদ্ধার্থবাবু সেদিন বলেছিলেনঃ

'আজ বাংলায় লড়াই চলছে। স্যার, বলা হচ্ছে নকশালবাড়ি কমিউনিস্টরা আমাদের লোক নয়। আমি বলতে চাই যদি কার্ল মার্কস নির্ভুল হন, যদি মাও নির্ভুল হন, তাহলে নকশালবাড়ির কমিউনিসটরা কি করতে চাইছেন কম্যুনিজমের মূল বক্তব্য থেকে। ইটালীর ভেরোনা থেকে চীনা কম্যুনিজমের বিষয়ে একটি বই বেরিয়েছে তাতে বলা হয়েছে কম্যুনিস্টদের সঠিক পথ হল চারটি শ্রেনীর যুক্ত ফ্রন্ট গড়া, এঁরা হলেন জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী কৃষক ও সর্বহারা – আজ যা এখানে হচ্ছে। তাঁরা জাতীয় বুর্জোয়া পাতি বুর্জোয়া কৃষক ও সর্বহারাদের নিয়েছেন। একেই বলা হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। শ্রেণীগত ঐক্য থেকে যুক্ত ফ্রন্টের লাভ ও শক্তি বৃদ্ধি হলে বাংলা কংগ্রেসের শক্তি বাড়বে না, ফরোয়ার্ড ব্লক বা এস এস পি-র নয় কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বাধীন এই যুক্তফ্রন্টের। এঁরা বিপ্লবের পথে এগুতে চাইবেন, দাবি করবেন জমির বন্টন ও ভূমিনীতির নয়ামূল্যায়নের। আজ যা নকশালবাড়িতে ঘটছে। নকশালবাড়ি বিষয়ে আমি বলতে চাই আপনারা মার্কসবাদকে ভালো করে মূল্যায়ন করুন। তাহলে দেখবেন নকশালবাড়ির কম্যুনিস্টরা ক্ল্যাসিকাল মার্কসবাদের পথেই চলেছেন, এটা অস্বীকার করার পথ নেই। আমরা যে কম্যুনিজম নিয়ে লড়ছি, আমরা যে কম্যুনিজমের বিরোধী সেই কম্যুনিজম আজ প্রভাব বিস্তার করছে অজয়কুমার মুখার্জির জনপ্রিয়তাকে সম্বল করে। এতে বাংলা কংগ্রেসের কোন লাভ হচ্ছে না। আখেরে কম্যুনিস্টরাই লাভবান হতে চলেছেন।.....'

সিধার্থবাবু সেদিন আরও বলেছিলেন। 'পশ্চিমবঙ্গে আজ শিল্প স্থানান্তরিত হচ্ছে। একদিন আজকের শ্রম মন্ত্রী সুবোধ ব্যানার্জি শৈলকুমার মুখার্জিকে শ্রমিকদের জন্য দু ফোটা চোখের জল ফেলতে বলেছিলেন। আমরা চেষ্টা করেছি শ্রমিকদের সহায়তা করার। কিন্তু শিল্পকে ধ্বংস করে তার জীবন ধারণের মূল শক্তিকে নষ্ট করে নয়। শিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প ও মাঝারী শিল্পের কথা বলা হয়েছে। শ্রমিকদের নিশ্চয় শিল্পের মুনাফার ন্যায্য অংশ দিতে হবে কিন্তু এর অর্থ কি এই সব শিল্প বন্ধ করে দিতে হবে? আজ বাংলা বিদেশী মুদ্রার সাড়ে তেত্রিশ ভাগ নিয়ে আসে সমগ্র দেশের বিদেশী মুদ্রা অর্জনের। আপনারা কি চান এটা ধ্বংস হোক? আজ বাংলা ধ্বংসের দিকে চলেছে, কাল ভারতবর্ষ ধ্বংসের পথে যাবে। বাংলা রাজনৈতিক সচেতন রাজ্য। আজ বাংলায় যে লড়াই চলছে এটা কংগ্রেস ও কংগ্রেস বিরোধীদের মধ্যে নয়, আজ কংগ্রেস বাংলায় লড়াই চলছে কম্যুনিজমের সঙ্গে কম্যুনিজমের বিরোধীদের।..... □

প্রতিচ্ছবি অথবা সনাক্তকরণ

দেবাশিস মৈত্র

অফিসটাইমে ডালহৌসীর বাসে উঠতেই লোকটির সংগে আমার দেখা। আলাপ নয়। ভারী সাধারণ চেহারা। অনেকটা মাছিমারা ও ঘুষখোর কেরানী মার্কা। লম্বা ছিপছিপে। বয়সের চাপে হোক বা ঘুষের ভারে হোক অথবা পরিবেশের নানা রকম প্রতিকূল অবস্থাতেই হোক — মেরুদন্ড আংশিক বেঁকে গেছে। বাতেও হতে পারে। ঠোঁটের দু'পাশ বেয়ে পানের কষ। মুখে জর্দার মনমাতানো খুশবুর বদলে বোধ হয় গুন্ডিরই গন্ধ হবে হয়তো। গুন্ডি দেওয়া পানের দাম বেশ কম। এককথায় অত্যন্ত সাধাসিধে চেহারা ও ম্যাটমেটে আচরণ। দশটা লোকের ভীড়ে নিতান্তই সাধারণের মতো হারিয়ে যাওয়া চেহারা। এত ঘটা ক'রে এরকম চেহারার বর্ণনা দেবার কিছুই নেই। কেননা এরকম চেহারা আমরা অহরহ দেখে থাকি হাটে বাজারে, অফিস-আদালতে, মাঠে ময়দানে অথবা নিতান্তই নিজেদের বাড়ি ঘরে। আবার কখনো কখনো উত্তরের নিষিদ্ধ পাড়ায়।

তবে লোকটিকে দেখে বেশ বিনয়ী মনে হ'ল আমার। স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতেই ভেতর বাইরে একবার চোখাচোখি। বাসে আমিই প্রথমে উঠেছি। কাজেই ভেতরে আমি। চোখে চোখ পড়তেই বিনয়ের হাসি হাসল লোকটি। বত্রিশ পাটি দাঁত হাঁ করে বের করা। যেন কোন দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপন। 'মুক্তো মাজনের মুক্তো হাসি।' বাসে প্রচন্ড ভীড়। রোজকার মত। গুঁতোগুঁতি করতে করতে লোকটা কোনরকমে পা-দানিতে পা রাখল। তারপর একে ওকে ডজ ক'রে একেবারে লেডিজ সিটের সামনে। লেডিজ সিটের কাছে প্রচন্ড ভীড়। ঠিকমত দাঁড়ানো যাচ্ছে না। আর এখানেই তো ভীড় হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের এদিকটায়ও যথেষ্ট ভীড় তবে তুলনায় কম। ওদিকে ভীড় যে শুধুমাত্র ছেলে-ছোকরাদের তাই নয়। আমার মত অনেক আরোহীকেই সেখানে দেখছি। লোকটিকে লেডিজ সিটের দিকে নির্বিকার ভাবে এগিয়ে যেতে দেখে এক পরিচিত জন বলল: মেন্টালিটি দেখেছো। বয়স হল। তবু...

লোকটি এখন এক কোনার দিকে দাঁড়িয়ে। বাসের প্যারালাল বার কোনক্রমে ধরে আছে। চোখে-মুখে বিরক্তির চিহ্ন। হয়তো বা লোক-দেখানো। সত্যিও হতে পারে। বাসের ঝাঁকুনিতে লোকটির শরীরও তালে তালে দুলে উঠছে। ঠিক সামনে দাঁড়ানো চব্বিশ বছরী আঁটো ভদ্রমহিলা চোখ কটমট করে মাঝে মাঝেই ওর দিকে অস্বস্তির চাহনি দিয়ে চাইছে। এতসব সত্বেও যখনই আমার দিকে ওর চোখ পড়ছে___লোকটি অতি বিনয়ের হাসি হাসছে। আকর্ণলম্বিত হাসি জ্বালা ধরায়। যেন আমি ওর কত পরিচিত। অথচ হৃদয়ডাঙগার হাটেও ওকে কখনো দেখেছি বলে আমার মনে পড়লো না।

বাসে যেতে যেতে চোখের দুপাশে কতকিছুই না পড়ে প্রতিদিন। নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। মনে থাকে না। মনে রাখার মত ব্যাপার নয় বলেই হয়তো। আজ যেতে যেতে ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির সামনে একটা বুড়িকে দেখলাম। অত্যন্ত সাধারণ। পোড় খাওয়া। মাথায় বোধহয় ঘুঁটেরই ঝাঁকা হবে। এতদূর থেকে ঠিক বোঝা গেল না। কলকাতা শহরে এরকম উদ্ধত ভাবে কোনদিন কোন ঘুঁটেকুড়ুনীকে কখনো দেখেছি বলে মনেও পড়ল না। বাস কালীবাড়ির সামনে একটু দাঁড়াতেই সবাই দু'হাত তুলে নমস্কার জানালো। জানি না কাকে। বুড়িকেও হতে পারে। তবে না হওয়াই খুব স্বাভাবিক।

ঠাকুরবাড়ি দেখলেই এরকম নমস্কার করার এই অভ্যেস আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি। কাজেই লোকে বলে নাস্তিক। বন্ধু-বান্ধবীরা বলে পরম নাস্তিক। আসলে আমি সেরকম নই মোটেই। ভক্তি শ্রদ্ধা হয়তো কিছুই আছে তবে লোকদেখানো নয়। নিজেদের ওপরে বিশ্বাস হরিয়ে গেলে, দুর্বলতা ঢাকা দেবার জন্যেই লোকে লোকদেখানো ভক্তি-শ্রদ্ধা করে বলে আমার বিশ্বাস। 'আমি'র ওপরে আমার অগাধ আস্থা। কাজেই এ পথ মাড়ানোর অভ্যেস আমার জন্মায়নি।

বুড়িকে দেখে ভারী কষ্ট হ'ল আমার। মা'র কথা মনে পড়ল। সংসারে একমাত্র আপনজন —— রক্তের জন। আমি বিবাহিত। কলকাতা থেকে বহুদূরে থাকেন আমার মা। আলিপুরদুয়ার। মাসের প্রথমদিকে উৎসুক হয়ে মনিঅর্ডার পিওনের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয় মাকে। ছেলেই তো সব নয়! সরকার বাহাদুরের ডাকযন্ত্রের কৃপাও একটা বড় ব্যাপার। ভাবলাম পয়সার অভাবে আমার মা যদি এই কাজ করেন! দুঃখ পেলাম। মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। মন চলে গেল সুদূর আলিপুরদুয়ারে। মানসচক্ষে দেখতে পেলাম — আমার মা ঠিক তেমনটিই রয়েছেন। মাসের আজ দ্বিতীয় সপ্তাহ। আমার পকেট কিছুটা হাল্কা হয়ে এসেছে। তবু মায়ের আঁচল বেশ ভারী।

এবার লোকটার দিকে আবার নজর পড়তেই ও আমায় নড় করার মত ভঙ্গিতে অভিবাদন জানাল। একগাল হাসি হাসল। অত্যন্ত সাধারণ হাসি। ।গজদন্ত বেরকরা হাসি। ওর এরকম গায়ে পড়া স্বভাবে আমার রাগ হ'ল। কিছু বলার কোন উপায় নেই। লোকটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার বাইরের দিকে তাকালাম।

লালবাজারের কাছে একটা বিশাল হোডিং-এ একটা ম্যাসাজ অয়েলের এ্যাড চোখে পড়ল। আনি কোম্পানির 'এ্যাড ভিটামিন ম্যাসাজ অয়েল ফোর্ট'। মডেল একজন উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী। স্কিন কালার হল্টার পরে বিশেষ এক উত্তেজক ভঙ্গিমায় বসে রয়েছে। ঠিক বুঝলাম না ম্যাসাজ অয়েলের বিজ্ঞাপনের সংগে এরকম উত্তেজক ভঙ্গিমায় বসে থাকার মিল কোথায়! এ্যাডের উত্তেজক মডেল দেখতে দেখতেই মনে হল ইন্দিরার কথা। ইন্দিরা আমার স্ত্রী। ভারী মিষ্টি মেয়ে। তবে এখন আর ভালো লাগেনা। রোজ রোজ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। জীবনটাও কেমন যেন একঘেঁয়ে হয়ে গেছে। রোজ সকালবেলায় বাজার তারপরে অফিস। দেরী হ'লে বড়বাবুর মুখ ঝাঁকানি নয়তো এ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টারে লাল আঁচড়। আর কাঁহাতক ভালো লাগে! আমি হাঁফিয়ে উঠেছি।

ইতিমধ্যে বাসটাও ব্যাংকশাল কোর্ট স্টপে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি নেমে পড়লাম। লোকটিও আমার সংগে সংগে নামলো।

তারপর সোজা নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর পথে। অটোমেটিক লিফট্-এ চড়লাম। আশ্চর্য লোকটিও আমার সঙ্গে একই লিফটের মধ্যে। লিফট উঠতে শুরু করেছে। লোকটি আমার দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে। মাঝে মাঝে মিট-মিট হাসছে। ওর দু'ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে পানের লাল কষ।

লোকটিকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বড় অসহ্য ও ক্যালাস মনে হচ্ছে। বারো তলায় বোতাম টেপা সত্ত্বেও লিফ্ট বারো তলায় থামলো না। উঠেই আবার নিচের তলায় নামতে শুরু করলো। তারপর একদম তলা থেকে আবার ওপরে।

আমি হেলপ্ হেলপ্ ব'লে চিৎকার ক'রে উঠলাম। বাইরে কেউই আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না। লোকটি দু'হাত দিয়ে কান চেপে রয়েছে। আমি আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম। বারো তলার বোতাম আরো জোরে টিপে ধরলাম।

লিফট্ না থেমেই আবার নিচে নামতে শুরু করল। এবার লোকটির সঙ্গে চোখাচোখি হল। লোকটি হাসছে। আমি অবাক হলাম। প্রচন্ড রাগও হ'ল ওর ওপরে। এর মধ্যে দেরীও হ'য়ে গেছে। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না।

আস্তে আস্তে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। লিফ্ট উঠছে আর নামছে। আমার চোয়াল দু'টো আরো শক্ত হয়ে উঠেছে। ও আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে।

এবার ওর গলা টিপে ধরলাম। প্রচন্ড জোরে। ওর সরু গলা এখন আমার দুই কব্জির মধ্যে। পা মাটি থেকে অন্ততঃ ইঞ্চি ছয়েক ওপরে।

আরো জোর করলাম। কব্জিতে যত জোর ছিল। একসময় ওর জিভ বেরিয়ে পড়ল। চোখও কোটর থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসেছে।

এবার ওকে ছেড়ে দিলাম আমার সামানে লোকটির মৃতদেহ। লিফ্টে নিঃসঙ্গ আমি।

মৃতদেহের দিকে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলাম। ভারী কষ্ট হ'ল। আহা এ কি করলাম! এখন আমার বুক কাঁপছে। চোখ দিয়ে দু'চার ফোঁটা জলও বেরিয়ে পড়ল।

একটু পরেই দেখলাম____লোকটির চেহারা আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছে। পাল্টাতে পাল্টাতে ক্রমে চোয়াল বসা; টাক পড়া, চোখ ঢোকা—ঠিক আমারই মত হয়ে গেল। যেন জীবন——সংগ্রামে বিধ্বস্ত এক সৈনিক। পরাজিতও।

এমন সময়ে ফ্লোর ইন্ডিকেটরে লাল আলো জ্বলে উঠল ও একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বারো তলায় লিফ্ট দাঁড়িয়ে পড়ল।□

লিটল ম্যাগাজিন হইতে সাবধান

□ কমল কুমার দত্ত

যত্র তত্র লেখা থাকে 'কুকুর হইতে সাবধান'! এর মানে এই নয় যে কুকুর মাত্র থেকেই সাবধান হওয়া দরকার।[কারণ আমার চেয়েও আপনারা ভালো জানেন যে কিছু কিছু কুকুর আমাদের সাবধান হবার সুযোগই দেয় না। তার আগেই তারা আরো সাবধানে লাঙ্গুলটিকে সযত্নে দু'পায়ের ফাঁকে গলিয়ে সরে পড়ে।] আমার এই লেখাটির শিরোনাম সেইরকম সব লিটল ম্যাগাজিনের হাত থেকে পালাবার সাবধানবাণী নয়, 'তেমন-তেমন' ক্ষুদে পত্রিকা থেকে সাবধান হ'তে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন খবরের কাগজে এক ধরণের বিশেষ বিজ্ঞাপন (পূজোর আগে হিড়িক পড়ে যায়) লক্ষ্য করে থাকবেন। ঐ বিজ্ঞাপনে আপনাদের কাছ থেকে লেখা প্রার্থনা করা হচ্ছে; বিজ্ঞাপনদাতা কোনো লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক। সে প্রার্থনার ভঙ্গী বৈচিত্র ও লক্ষনীয়! কেউ লেখেন–'আপনার লেখাটি আজই নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন'; কারো দাবী 'নতুন লেখক লেখিকাদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেওয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য'; কেউবা 'নামীদামী লেখক কবির পাশাপাশি আপনার লেখাটি' ছেপে দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। এইসব বৈচিত্র্যের মাঝের ঐকটুকু আপনার নজর এড়িয়ে যায়নি আশা করি। সে হচ্ছে 'জবাবী খামে লেখা পাঠাবেন'। খবর্দার পাঠাবেন না! পাঠালেই মরেছেন! সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে এসে হাজির হবেন আপনারই পাঠানো জবাবী খামটি, আর তার ভেতর থেকে নির্ঘাৎ পেয়ে যাবেন ঐ পত্রিকার নিয়মাবলী,–যার সাদা অর্থ–আপনার পাঠানো লেখাটি ছাপতে আপনাকে কত টাকা দিয়ে তাদের 'সহযোগিতা' করতে হবে তারই নির্দেশ। এই 'সহযোগিতা' অর্থমূল্যের তারতম্য অনুসারে নানা স্তরে বিভক্ত, যেমন–সাধারণ সভ্য চাঁদা, বিশেষ সভ্য চাঁদা, গ্রাহক চাঁদা, আজীবন সভ্য চাঁদা। কিছুকিছু লিটল ম্যাগাজিনে আবার table দেওয়া থাকে–যা থেকে অতিসহজেই আপনি জেনে নিতে পারবেন ক' লাইনের কবিতার জন্য বা ক' পৃষ্ঠার গদ্যের জন্য আপনাকে কি পরিমাণ 'সহযোগিতা' করতে হবে। যারা গ্রাহক চাঁদা দিয়ে 'সহযোগিতা' করেছেন তাঁরা লেখা ছাপার 'অগ্রাধিকার' এবং নিয়মিতভাবে সংখ্যাগুলি পাবেন। যেমন ধরুন যে পত্রিকাটি মাসিক–বছরের সেই পত্রিকার বারোটি সংখ্যা পাবার হক্ আপনার। তাই-ই পাবেন তবে দুই বা তিনবার প্রকাশিত হবে। দুইবারের ক্ষেত্রে আপনি ছ'টি সংখ্যা একবারে এবং তিনবারের ক্ষেত্রে চারটি করে সংখ্যা একবারে পেয়ে যাচ্ছেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা হয়তো একই থাকবে। কিন্তু তাতে কী! পত্রিকার কভারে বড়-বড় করে লেখা থাকবে 'গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-সংখ্যা' বা 'সমবেত সংখ্যা'। হিসেবের কোনো গোলমাল পাবেন না। এছাড়া শারদীয় সংখ্যার জন্য 'গ্রাহকদের আলাদা মূল্য দিতে হবে না'। এরকম একটি পত্রিকার ঠিক এক পৃষ্ঠার শারদীয় সংখ্যা পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

এ পর্যন্ত গেল 'সাধারণ পদক্ষেপ', অসাধারণ পদক্ষেপও আছে। এইসব পত্রিকার উদ্যোগে মাঝেমাঝে 'সংকলন' বেরিয়ে থাকে। সমবায় পদ্ধতিতে। এক হাতে টাকা আর অন্য হাতে লেখা দিয়ে আসুন____সসম্মাণে প্রকাশিত হবে। যে টাকা দিয়েছেন সেই মূল্যের পত্রিকাও আপনাকে দেওয়া হবে। আপনি উই এবং ইঁদুরের উদ্দেশ্যে সেগুলি স্বগৃহে সংরক্ষণ করবেন এবং চেনা-অচেনা-নামমাত্র চেনা কেউ এলেই সেই সংকলনটি খুলে আপনার লেখাটি exhibit করবেন। এই ধরণের সংকলন-লক্ষ করে দেখবেন বেশীর ভাগ কবিতার হয়ে থাকে। কারণ তাহলে অল্প জায়গায় বহুখন্দের-সমবায় সম্ভব। তেমন-তেমন হাতে পড়লে এই ধরণের সমবায় প্রচেষ্টা থেকে ভালো দুধই দোয়ানো যেতে পারে।

আরেক কায়দা 'সাহিত্য প্রতিযোগিতা' অমুক লিট্ল ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে....ইত্যাদি। চাকুরির দরখাস্তের সঙ্গে পোস্টাল অর্ডারের মতো এখানে লেখার সঙ্গে 'প্রবেশ মূল্য'। যেহেতু বেকার সমস্যার মতো এখন উঠতি কবি লেখকের সংখ্যাও ভয়াবহ, তাই এধরণের প্রচেস্টাও কিছু দুগ্ধ প্রদান করে থাকে।

এছাড়া স্থানীয় বিজ্ঞাপনও কিছু দুধ দেয়। অমুক মিষ্টান্ন ভান্ডার, তমুক স্টেশনারী দোকানের বিজ্ঞাপনটুকুই লিট্ল ম্যাগাজিনের পাতায় আপনারা দেখে থাকেন। বাকীটুকুর সাক্ষী সম্পাদক। বিজ্ঞাপন দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটি অক্ষম রচনাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব বিজ্ঞাপনদাতারা সম্পাদকের হাতে দিয়ে থাকেন। বিজ্ঞাপনের দুধের লোভে এই চাঁটি হজম করে সম্পাদক তা ঝুলিয়ে দেন নিজের মাসিক বা ত্রৈমাসিক পাঁঠার গলায়।

এইভাবে বিভিন্ন ভঙ্গিতে আদায়ীকৃত টাকার বিনিময়ে পাওয়া লেখা নিয়ে সম্পাদকের নিজস্ব যে পাঁঠাটি বাংলাসাহিত্যের নন্দনকানন তছনছ করে ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দে ঘুরে বেড়ায়, কার সাধ্য গায়ের দুর্গন্ধে তার কাছ ঘেঁষে! □

ধারাবাহিক

নূপুরের মতো

অনুলিখন ঃ অনুপমা দাশ

একুশ

।। বারো ।।

সিমৃকি

মাদমেহাজেল সিমন বারবিয়ে, এটাই সিমৃকীর আসল নাম। ফরাসী দেশের এই মেয়েটি উনিশশ চব্বিশ সাল থেকে চুয়াল্লিশ সাল পর্যন্ত নিঃস্বার্থ ভাবে, গভীর আন্তরিকতার সংগে ছিলেন উদয়-শঙ্করের।

দাদা বলেন, সিমৃকীর শিব-পার্বতীর নৃত্য সত্যিই আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত শিব-পার্বতীর ছবির জীবন্ত রূপ।

এই কথাটি শুনেই আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হই। কারন সিমৃকী বিদেশিনী, তাঁকে দেখে ভারতীয় দেবীর কথা মনে হয় কি করে? এই কথা দাদাকে জিজ্ঞাসা করাতে দাদা বললেন, 'সিম্ ছিলই অমনি। ওর ঐ আত্মসমাহিত দৈনিক ভাবটাই তো আমাকে আকর্ষণ করেছিল। তা দেখেই আমি ওকে পার্টনার করে নিয়েছিলাম। আর সেই থেকে টানা কুড়ি বছর আমার সঙ্গে কাজ করেছে। সময়ে-অসময়ে সব রকম অবস্থার মধ্যে ঠিক বন্ধুর মত সর্বদা সঙ্গে থেকেছে। ও ছিল আমার বিরাট সহায়।

বিখ্যাত ইম্প্রেসারিও সলোমন হিউরক তাঁর ইম্প্রেসারিও বইটিতে দাদার বিষয়ে লিখতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—

উনিশ শ' বত্রিশের ডিসেম্বরে ওরা এলো। রোগা পাতলা মিষ্টি গলার জন পনেরোর দল। নজর কাড়ার মতো নয়। কেউই তেমন দীর্ঘ নয়, দু'জন তো বেশ ছোটখাটোই। এদের একজন সিমৃকী। ফরাসি মেয়ে। শঙ্করের প্রেমে হিন্দু হয়েছে। ঝলমলে পোশাক। মাথাভরা কালো চুলের রাশ যেন মোল্লায়েম শিরোভূষণ ওর। কপালে লাল বড়ো টিপ। দেখলে, দলের অন্য সব হিন্দুমেয়ের চাইতে তাকেই মনে হবে সত্যিকার হিন্দু মেয়ে।

মাদাম রণর্জের মাধ্যমে প্যারিসেই আমার আলাপ হয় সিমৃকীর সংগে। মাদাম রণর্জের কাছে শুনেছিলাম ও খুব ভাল পিয়ানো বাজায়। আর তাই প্রথম-প্রথম সিম্ পিয়ানোই বাজাতো আমার সঙ্গে।

সিমন আর মিশেল এদের দু'জনের সঙ্গে আলাপ হবার পর এদের সরল, সুন্দর ভদ্র ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে। ওরা প্রায়ই আমাকে তাদের বাড়িতে খাবার নেমতন্ন করতো।

মিশেলের বাড়িতে তার বাবা, মা, বোন আছে। কিন্তু সিমনের বাড়িতে একমাত্র তার মা ছাড়া আর কেউ নেই। বাবাকে সে খুব ছোট বেলায়ই হারিয়েছে। তাঁর কথা সিমের বিশেষ কিছুই মনে নেই।

সিমৃকীর বাড়ি খেতে যাবার একটা মস্ত আকর্ষণ ছিল মাদাম বারবিয়ের রান্না। মনে পড়লে এখনও জিভে জল এসে যায়। একে তো ফরাসি জাতটাই বিদেশি লোককে বড় তাড়াতাড়ি আপন করে নেয়। তায় আবার মাদাম বারবিয়ের মত সুগৃহিনী। কাজেই সিমৃকীর বাড়িতে আমি হয়ে উঠেছিলাম ওদের পরিবারেরই একজন।

আমি সে সময়ে থাকি মাদাম মিয়ারের বাড়িতে চারতলার একটি ঘরে। অনেক স্টুডেন্ট আসতো এসময়ে বাড়িতে নাচ শিখতে। সিমও আসতো, তবে নাচতে নয়, পিয়ানোয় সাহায্য করতে।

একদিন সকালের দিকে কোন কাজ না থাকায় চলে গিয়েছিলাম সিমৃকীর বাড়ি। ওর মা আমাকে বসতে বলে বললেন, 'এস শঙ্কর, তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে, সেই কখন থেকে সিমন পিয়ানো বাজাচ্ছে, ছ'সাত ঘণ্টা হয়ে গেল। এ সময়টা ও রোজ প্র্যাকটিস করে কিনা!'

বললাম, বেশ তো, আমি বসি, আমার কোন তাড়া নেই।

কতক্ষণ বসেছিলাম জানিনা, তবে শুনতে পাচ্ছিলাম পাশের ঘরে সিমৃকী বাজাচ্ছে। শুনতে শুনতে বুঝতে পারলাম দীর্ঘদিনের একাগ্র সাধনা থাকলে তবেই এমনি বাজনা সম্ভব। তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু অনুভূতির দিক দিয়ে সে যে কী অপূর্ব তা বলবার নয়।

একসময় বাজনা থামলো। কিন্তু রেশ রয়ে গেল। একটা ঘোরের মধ্যে যেন রেখে গেল আমাকে। শুনেই আমার অমনি লাগছিল, তাহলে যে বাজাচ্ছিল এতক্ষণ তার অনুভূতি এখন কত গভীরে তা ভাবা যায় না। সত্যিই তাই, সিমৃকী যখন এঘরে এলো, তখনও যেন ওর ধ্যান ভাঙেনি, ভালভাবে কথা বলতে পারছে না পর্যন্ত। যেন কিসে ডুবে রয়েছে সে। সশ্রদ্ধ চোখে সেদিন দেখেছিলাম এখনও ওর হাতের আঙুলগুলি যেন সঞ্চালিত হচ্ছে, থরথর করে কাঁপছে সেগুলি।

কিছুদিনের মধ্যে মাদাম মিয়ারের বাড়িতেই কি খেয়ালে ওকে বলেছিলাম নাচ শিখতে। আশ্চর্য, কোন আড়ষ্ট ভাব নেই, জড়তা নেই চট করে উঠে দাঁড়ালো। একবার শুধু বললো, 'দাদা, আমি কি পারবো?' 'চেষ্টা করেই দেখ না।' এই বলে আরম্ভ করলাম। চটপট করে তুলে নিতে লাগলো মুভমেন্ট। একেবারে নিখুঁত না হলেও ওর আগ্রহ বা ওর নিজেকে ভুলে গিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে যাওয়া দেখে আমার অবাক লাগলো। আর সেদিন থেকেই সিরিয়াসলি আমিও এই কাজটি নিলাম। কারণ ও পারবে করতে আমি যা চাই।

ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন এসবের প্রতি মাদাম বারবিয়েও সিমৃকী দু'জনারই আগ্রহ। অ্যানি বেসেন্তের থিওসফিক্যাল সোসাইটির একজন উৎসাহী সদস্য সিমৃকী।

ধীরে ধীরে চললো সিমৃকীর নাচের শিক্ষা। ওর ভঙ্গি, ওর অভিব্যক্তি আমাকে অবাক করলো—কোন ভারতীয় মেয়ের পক্ষে এত দৈবিক ভাব আনা সম্ভব হয় নি।

লণ্ডনে ওয়েম্বলি একজিবিশনে কতদিন আগে করেছিলাম 'শিবনৃত্য' একা, এখন সিমৃকী আসাতে তৈরি হলো 'শিব-পার্বতী' নৃত্য। হাতের জোড়গুলি ভেঙে-ভেঙে ছোট-ছোট মুভমেন্টগুলি কী সুন্দর করে ও করতো। মনে আছে মাদাম পাবলোভাও এত সুন্দর করে করতে পারেননি—আর ঐ নমনীয় ভাবটা ফোটাতে পারতেন না বলে সময় সময় মাদাম নিজের হাত কামড়ে প্রায় চোখে জল এনে ফেলতেন।

যাইহোক, প্যারিসেই প্রথম প্রথম আমার ও সিমৃকীর 'শিব-পার্বতী' দেখে ফরাসিরাই বিশ্বাস করেনি যে সিমৃকী ভারতীয় নয়। সে সময় সিম ও মিশেল দু'জনেই হাত-পা সবই পেন্ট করতো, যাতে তাদের গায়ের ফ্যাকাসে সাদা রঙটা ঢাকা পড়ে তাদের আরও বেশি ভারতীয় করে তোলে।

সিমৃকী কাজের সময় এত শান্ত, এত সিরিয়স, কিন্তু অন্য সময় কিছু না কিছু দুষ্টুমি করেই। তাছাড়া কখনও খালি হাতে বসে থাকতো না। এটা করবে, ওটা পরিষ্কার করবে, ঘর-দোর গুছিয়ে রাখবে, অর্থাৎ সর্বদাই বাড়িময় কিছু না কিছু করে বেড়াচ্ছে। এক সঙ্গে কাজ করতে করতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম ওর এই সহজ ব্যবহারে। তাই ছোট বোনকে অর্ডার দেবার মত বলেও ফেলতাম—সিম্, অমুকটা তুলে রাখো, কিংবা সিম্, এটা দাও

ইত্যাদি। সিমৃ চটে গিয়ে বলতো, 'আমাকে অর্ডার দিচ্ছ যে, আমি কি তোমার চাকর ?' আমি অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে থাকলে ও নিজেই বলতো, 'দাদা, টেল মি হোয়াট টু ডু।'

প্যারিসে থাকার সময়ই আমরা এক হলিডেতে গ্রামে বেড়াতে যাই। মিশেলদের গোটা পরিবার, সিমৃকী ও তার মা এবং আমি এই ক'জনে মিলে ক্রমে গ্রামে বেড়াতে যাই। প্যারিস থেকে মাইল চল্লিশ দূরে একটি গ্রাম, ছোট-ছোট বাড়ি, তার মাঝখান দিয়েই রাস্তা, শষ্যক্ষেত, খোলা মাঠ, সরল সাদাসিধে লোক, একেবারে শান্ত একটি গ্রাম। প্যারিসের জ্বলজ্বলে চাকচিক্যের কোন ছাপই নেই এখানে।

গ্রামের মধ্যে একটিই পাকা বাড়ি। সেটা ভাড়া নিয়ে রইলেন ওঁরা সবাই, আর আমি রইলাম তার পাশেই এক গ্রামবাসীর অতিথি হয়ে।

একটা ঘর আলাদাভাবে তারা দিয়েছিল আমাকে। কী আদর-যত্ন, সুন্দর ব্যবহার। বড় মজা—শুয়োর, মুরগি, হাঁস, কুকুর, বেড়াল ইত্যাদি তাদের যত পোষা জন্তু ঘরের মধ্যেই এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। যেই কিছু নোংরা করছে, অমনি পরিষ্কার করে দিচ্ছে লোকেরা। আর তার মধ্যেই চলছে সব রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়া, তাদের খাবারের মধ্যে উপাদেয় খাদ্যটি হলো খরগোসের মাংস মদের সঙ্গে মিশিয়ে বিশেষভাবে রান্না করা।

আমি বেশির ভাগ দিনই এদের সংগেই খেতাম, আবার কখনো কখনো সিমৃকী বা মিশেলদের সঙ্গেও খাওয়া-দাওয়া হোত।

সিমৃকী রোজ একবার করে আমার কাছে আসতো। নিজের বোনের মত ঘরটা গুছিয়ে ধুলো ঝেড়ে সব হাতের কাছে গুছিয়ে দিয়ে যেতো। কোন-কোন দিন সেখানেই নিত নাচের লেসন। কখনও বা পাশ দিয়ে চলে যেতো শুয়োর, কি মুরগি। ও চমকে গিয়ে 'আলেভুর্জা আলেভুঁজা' বলে আবার মন দিত কাজে।

সাধারণত: সকালের দিকে আমি একটা থলিতে বড় গোটা ফ্রেঞ্চব্রেড, ওঁয়ারুস্ ও ট্যাবলো রঁ বা ত্রিকোণ চকোলেট ভরে সাইকেল নিয়ে বেড়িয়ে পড়তাম গ্রাম দেখতে। কোন ভয় নেই ওখানে। পথ ধরে সাইকেল চড়ে কোথায় না কোথায় গেছি। বড় ভাল লাগতো একা একা অমনিভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে। এই সাইকেল নিয়ে বেড়াতে গিয়েই ঘটেছিল মজার এক ঘটনা।

ফাঁকা রাস্তায় সাইকেল চালাচ্ছি, অনেকটা দূরে রাস্তার উপর দিয়ে চলেছে এক মহিলা প্রায় মধ্যিখান দিয়ে। আগে থেকেই বেল বাজালাম, কিন্তু স্পিড় কমাইনি। ভেবেছিলাম বেল শুনে মহিলাটি পাশে সরে যাবেন। কিন্তু তিনি তেমনিই চলতে লাগলেন, সরলেন না। এদিকে আমি কাছে এসে পড়েছি। ঘন-ঘন বেল বাজিয়ে তাকে সতর্ক করে দিয়ে আমি পাশ দিয়ে চলে যাবো ভেবে যেই সরেছি, অমনি মহিলাটিও সেইদিকে সরে গেলেন। অর্থাৎ লাগলো জোর ধাক্কা। আমি পড়ে গেলাম, আর মহিলাটিও রাস্তার উপর পড়লেন। পড়তে পড়তে দেখলাম মহিলাটি খুব বৃদ্ধা, বোধ হয় সেইজন্যই এতক্ষণ আমার বেল শুনতে পাচ্ছিলেন না। ওখানকার রাস্তাগুলো দু'পাশে গড়ানো ও সোজা নেমে গেছে ক্ষেতের দিকে। আমি স্পিডের উপর সাইকেল থেকে পড়েছি। তাই মোমেনটামের ফলে সরসর করে বুকের উপর ঘেষড়ে অনেকটা নেমে গেলাম ক্ষেতের দিকে। ঠিক যেখানটা গিয়ে আমি থামলাম, সেখানে সামনের দিকে তাকিয়েই আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। জায়গাটা ঢালু হওয়ায় আমার পা উপরে এবং মাথা নিচের দিকে এবং আমার মাথার থেকে দু'আঙুল নিচে তলোয়ারের ফলার মত তীক্ষ্ণ ও ছুঁচালো একটি ডগা মাটির উপর জেগে আছে। তেরছাভাবে কাটা গাছের একটি সরু কান্ড মাটি থেকে আধ হাত উঁচুতে মাথা তুলে রয়েছে। আমি আস্তে করে হাতটা ওর উপর দিলাম। উ: কী তীক্ষ্ণ ! আমি যদি আর একটু গড়িয়ে যেতাম, তাহলে স্পিডের মাথায় ডগাটা আমার গলার কাছে বিঁধে যেতে পারতো। আর যে রকম শক্ত ও ছুঁচলো তাতে যে কী হতে পারতো তা ভাবতেই কেমন লাগে।

সম্বিত ফিরে আসতেই উঠে দাঁড়িয়ে সেই ভদ্রমহিলার কাছে ছুটে এলাম। তাঁকে তুলে দিলাম। ভগবানের দয়ায় তিনি বিশেষ চোট পাননি। তার কাছে ক্ষমা চেয়ে সেদিন আমি ফিরে এলাম বাড়ি। আমার হাত-পায়ের চামড়া ঘেষড়ে উঠে গিয়েছিল।

যাক বলছিলাম সিমৃকীর কথা। ওর নাচের ট্যালেন্ট দেখে সত্যিই আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।

ওদের পরিবারেও কেউ কখনও নাচ শেখেন নি। তবে ওর এক কাকিমা নাচ করতেন। সে বড় মজার নাচ। উনিও কারও কাছে নাচ শেখেননি। কিন্তু তাঁর নাকি ভর হয়, আর সেই সময় বিখ্যাত সব মাস্টারদের মিউজিক কমপোজিশনের উপর তিনি নাচ করেন। সে নাচ তাঁর একান্তই নিজস্ব নাচ। কিন্তু তাঁর মধ্যে কিছু একটা আবেদন ছিল, সেটা যে কী তা সঠিক ভাবে বলা বড় মুশকিল।

সিমৃকীর এই কাকিমা পাবলিক শোতেও অ্যাপিয়ার হয়েছেন অমনিভাবে।

এইভাবে ভর হওয়া নাচকে বলা হয় ক্লারভায়াঁ। এগল্প হয়তো অনেকেরই অবিশ্বাস্য লাগবে। কিন্তু আমার জীবনে এমনি ঘটনা আমি দু'বার দেখেছি।

যাক, এই ভর হলে নাচ করার কথাটা ভুলিনি বলেই যখন শুনেছিলাম যে সিমৃকীর কাকিমা অমনিভাবে নাচ করেন, তখন তা একেবারে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিইনি। পাবলিক থেকে যে মিউজিক অনুরোধ করতেন সেই মিউজিকের উপরই তিনি নাচ করতেন। আর সে নৃত্য কোন উদন্ড নাচ নয়। বরং তাঁর নাচের মধ্যে একটা শান্ত মধুর ভাবই থাকতো।

সিমৃকীর আসল নাম সিমন এবং ডাকনাম হিসাবে সিমনই চলতো। আর সিমৃকী নামটা রেখেছিলাম আমি।

একবার পূর্ববঙ্গে শো দিতে গিয়েছি আমার ট্রুপ নিয়ে, ত্রিশ দশকের কোন এক সময়ে। রাস্তায় হঠাৎ শুনি ছোট-ছোট ছেলেদের আনন্দ উল্লাস 'সিমৃকী-সিমৃকী-সিমৃকী, সিমৃকী আমার নিমৃকী।'

শুনে তো আমরা হেসে আকুল। সিম আমায় জিজ্ঞাসা করলো, 'দাদা, নিমৃকীর মানে কি ?' এক রকম নোনতা খাবার-শুনে ও খুব খুশি।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত আগ্রহ ওর, কিন্তু প্রথম প্রথম ও এত নার্ভাস বোধ করেছিল এদেশে এসে নাচ করতে, যে বলবার নয়। ওর বড় চিন্তা ছিল সাদা চামড়া দেখে হয়তো লোকে পছন্দ নাও করতে পারে। কিন্তু যখন প্রথম শোয়ের পর সবাই ওর সাফল্যে পঞ্চমুখ হলো তখন ও আনন্দে কেঁদে ফেলেছিল, 'আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি।'

ওর এই ভারতবর্ষের প্রতি ভালবাসাই ওকে মনে-প্রাণে ভারতীয়া করে তুলেছিল। আর দাদার সংস্পর্শে সে টান পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

নিজের সাদা চামড়া নিয়ে এত চিন্তার কারণ হলো, দাদার মুখে শুনেছি যে বিদেশে সিমৃকীর, তথা সাদা চামড়ার লোকের ভারতীয় ব্যালেতে স্থান নেওয়াকে নাকি কয়েক জায়গায় ভালভাবে নেয়নি। ভারতীয় নাচ, ভারতীয় কৃষ্টি, ভারতীয় পোশাক, ভারতীয় যন্ত্র, এসবের সংগে ভারতীয় গায়ের রংও ছিল তাদের কাম্য। তাই অন্যান্য ব্যাপারে যোগ্যতা অর্জন করলেও সাদা গায়ের চামড়া সিমৃকীকে বিব্রত করেছে বারবার।

অনর্গল পরিষ্কার বাংলা বলতে শিখেছিলেন সিমৃকী। প্রথম যেবার ভারতে এলেন তিনি, দাদা তখন কলকাতায় এলগিন রোডের বাড়িতে। সেখানে তখন রয়েছেন শঙ্করণ নামবুদ্রিপাদ। দাদা গেলেন বোম্বাই থেকে সিমৃকীকে কলকাতায় নিয়ে আসবার জন্য।

ট্রেনে আসবার সময় বোম্বাই থেকে কলকাতা, এরই মধ্যে সিমৃকী আয়ত্ত করেছিলেন সব কথাকলি মুদ্রা। শিক্ষক দাদা। দাদার কাছে শুনেছি যে, অমনি সময় কাটানোর জন্য দাদা তাঁকে দেখিয়েছিলেন মুদ্রাগুলি। আর তাই দেখে সিমৃকী শিখেছিলেন সব। পথে আসতে আসতে রিজার্ভ কামরায় বসে বারে বারে অভ্যাস করতে দেখে দাদা নিজেই আগ্রহান্বিত হয়ে তাকে সব মুদ্রাগুলি শিখিয়ে দেন। কী সুন্দর মনোযোগ দিয়ে, মনপ্রাণ দিয়ে সেগুলি রপ্ত করছিলেন সিমৃকী, তাতে অবাক দাদা। আর তাই কলকাতায় বাড়িতে পৌঁছে বিশ্রাম করে গুরু শঙ্করণ নামবুদ্রিপাদকে যখন দাদা বললেন যে, ট্রেনে আসতে-আসতে সিমৃকী আয়ত্ত করে ফেলেছে মুদ্রাগুলি তখন গুরুও বিশ্বাস করতে পারেননি তা। একে বিদেশিনী, তায় সদ্য পরিচিতা। গুরু অবিশ্বাস করলেও মুখে কিছু বললেন না। আলাপ করিয়ে দিয়ে দাদা বললেন, 'এই সিমৃকীই আমার পার্টনার এবং শিব-পার্বতী নাচে ওই করে পার্বতীর নাচ।'

কন্যাসমা বিদেশিনী এই মহিলাটির চোখে-মুখে পার্বতীর সেই পবিত্রতা লক্ষ্য করেও সংকোচে তখন চুপ করেই ছিলেন গুরু। কিন্তু সিমৃকী যখন নাচের পর এক অবলীলায় নির্ভুলভাবে দেখাতে লাগলেন মুদ্রাগুলি, তখন আর আবেগ চেপে রাখতে পারলেন না গুরু। দু'হাত বাড়িয়ে সস্নেহে বুকে টেনে নিলেন সিমৃকীকে। আর তার মাথায় স্নেহ চুম্বন দিয়ে আশীর্বাদ করে দাদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সত্যিই এ পার্বতী, গৌরী। ও আমার মেয়ে, আমার কন্যা।'

সিমৃকী ও গুরুর এই সাক্ষাৎকারের স্মৃতি এত মধুর যে বলবার নয়। আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছিল সকলের। কেননা অতি শৈশবেই নিজের বাবাকে হারিয়ে পিতৃহীন হয়েছিল সিমৃকী।

গুরুর কাছে দিনে-দিনে সিমৃকী কত আদরের হয়ে উঠেছিলেন যে আলমোড়ায় মন্দিরে পূজার সময় পর্যন্ত তাকে কাছে নিয়ে পূজায় বসতেন গুরু। সিমৃকী সাহায্য করে দিতেন তাঁকে।

দীর্ঘ কুড়ি বছর কেটেছে সিমৃকীর সঙ্গে দাদার। অনেক ঘটনা, অনেক অভিজ্ঞতার কাহিনী সেসব। বিশদভাবে বলা সম্ভবও নয়।

তবে প্যারিসে দাদার সঙ্গে ফলিবেসিয়ার মিউজিক হলে গিয়ে সিমৃকীর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, বা ভারতে এই কলকাতায় দাদার উদ্দেশে প্রদত্ত এক পার্টিতে ভারতীয় সমাজের উচ্চস্তরের নরনারীর বেসামা[illegible] আচরণ দেখে অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ, [illegible] প্যারিসে থাকাকালীন এক ভারতীয় মহারাজার বিশেষ উদ্দেশে কেবলমাত্র সিমৃকীকে ব্যক্তিগত আমন্ত্রণের উত্তরে তার স্পষ্ট জবাব, 'মহারাজা, তোমাকে একলা খুশি করার চেয়ে স্টেজের উপর কাজের মধ্য দিয়ে সমগ্র দর্শকমন্ডলীকে আনন্দ দেওয়ার দায়িত্ব আমার কাছে অনেক বড়।'—এ ধরণের ছোট ছোট মুহূর্তগুলি থেকে সিমৃকীর একটা স্পষ্ট ছবি আমরা পাই বই কি।

ভারতবর্ষে একবার এক মহারাজার বাড়িতে দাদা ও সিমৃকীর নিমন্ত্রণ ছিল। পান ও আহারের যথেষ্ট আয়োজন হয়েছে। নিমন্ত্রিত বহুলোক উপস্থিত। তখন আমের সময়, তাই খাদ্য তালিকায় আমও ছিল। এবং বলা বাহুল্য যে বাজারের শ্রেষ্ঠ ফলই আনা হয়। সিমৃকী একেবারে মুগ্ধ এই ফল খেয়ে। সুন্দর করে প্লেটের উপর ছোট-ছোট টুকরোয় কাটা আম। যেমন তার স্বাদ, তেমনি তার গন্ধ।

হঠাৎ সেই মহারাজা সিমৃকীকে বললে, দেখুন, আমতো আপনার খুব ভাল লেগেছে খেতে, এখন সাধারণ লোক আম কি ভাবে খায় দেখুন। এই বলে খোসা সমেত আস্ত একটি আম দাঁত দিয়ে ছুলে চুষে চুষে খেলেন। শুধু তাই নয় আঁটিটি ভাল করে চুষে নিয়ে পরিশেষে কোর্তার হাত গুটিয়ে কনুই পর্যন্ত গড়িয়ে পড়া রস চেটে-চেটে খেলেন। বলা বাহুল্য যে, দৃশ্যটা সুদৃশ্য ছিল না। তাই মহারাজার 'কেমন দেখলেন মাদমোয়া-জেল?' এর উত্তরে সিমৃকী অসংকোচে বললেন, 'আমি খুব খেতে সুন্দর জানি, কিন্তু তুমি যা দেখালে তা মোটেই সুন্দর নয়।'

সিমৃকী তার ঘরোয়া ও ব্যক্তিগত জীবনেও এমনি স্পষ্টভাষী ছিলেন।

শো আরম্ভ হবার আগে পোশাক পরে একেবারে তৈরি হয়ে নিয়ে চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকতেন সিমৃকী। তাই দেখে দাদা একবার জিজ্ঞাসা করেন, 'অমনিভাবে কি ভগবানকে ডাকছো নাকি?'

সিমৃকী উত্তর দিলেন, 'আমি মনে মনে আওড়ে নিচ্ছি যা যা আমাকে শো-এ করতে হবে তাই।'

দাদার সঙ্গে থাকার সময়ে সর্বদাই ছায়ার মত ফিরেছেন তিনি দাদার পিছনে-পিছনে। একবার ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয়োতে এক ঘরোয়া সমাবেশে সিমৃকীর সঙ্গে আলাপ হয় গহরজান নামে এক মহিলার। মহিলাটির সংযত রুচিপূর্ণ বেশবাস ও ব্যবহার এক সুন্দর ছাপ ফেলে তাঁদের মনে। অথচ উপস্থিত বাদবাকি মহিলাদের প্রগলভ সাজসজ্জা ও আচরণে তাঁরা উভয়েই বিরক্ত ও লজ্জিত হন। আশ্চর্যের বিষয় এইসব মহিলারা নাকি শ্রীমতী গহরজানের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের অভিজাত ও ভদ্রপরিবারের এবং শ্রীমতী গহরজানকে নাকি সমাজের মাপকাঠিতে 'ভদ্রমহিলা'ও বলা যায় না।

একথা জানতে পারার পর সিমৃকী অসংকোচে বলেছিলেন, 'নারীত্বের যে স্নিগ্ধ ভদ্ররূপ এই গহরজানের মধ্যে রয়েছে, সেই দিক দিয়ে বিচার করলে অন্যান্য বড় ঘরের মহিলারাই সত্যিকারের নিচে নেমে যান। গহরজানের সঙ্গে এদের কোন তুলনাই হয় না।'

দাদার আলমোড়া সেন্টারেও ছিলেন সিমৃকী। সেখানে সকলের ভালবাসা ও প্রীতি নিয়ে তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী। আলমোড়াতেই দাদার বিবাহের পর সিমৃকীও বিয়ে করেন আলমোড়ারই এক বাঙালি ছাত্রকে।

তারপর নানান কারণে সেন্টার ভেঙ্গে গেলে সিমৃকী আকাশবাণীর ফরাসী বিভাগের অধিকর্তা হিসাবে দিল্লিতে বসবাস শুরু করেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এবং কিছুদিন পরে এক ধনী ইংরেজ ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু ভারতবর্ষ ছেড়ে তিনি যাননি। বোম্বাইতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন তাঁরা

সম্প্রতি অর্থাৎ উনিশ' চুয়াত্তর সালের এপ্রিল মাসে সিমৃকীর স্বামীর মৃত্যু হয় এবং সর্বশেষ খবরে জানতে পেরেছি যে, সেই সূত্রেই বিশেষ কাজে মাদাম সিমৃকীকে যেতে হয়েছে লন্ডনে

তেরো ।।

বিষ্ণুদাস শিরালী

বিষ্ণুদাস শিরালীজীর সঙ্গে দাদার পরিচয় হয় প্যারিসে। উনিশশ'. কুড়ি সালে অঙ্কনবিদ্যার ছাত্র হিসাবে ভারত ছাড়ার পর নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ঠিক যেন রূপকথার মতো কেটেছে দাদার জীবন।

টানা দশ বছর বিদেশে থাকার পর উনিশশ' ঊনত্রিশ সালের শেষের দিকে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন দাদা। ঠিক দেশে ফেরার আগে আগেই প্যারিসের সমার্ত অঞ্চলের ক্যাথেড্রাল সেক্রেকারের আঙিনায় বিষ্ণুদাস শিরালীজীর সঙ্গে দাদার পরিচয়

বিদেশে দুই ভারতীয় তরুণের আলাপ হতে দেরি লাগেনি। সেদিনের ঘটনা মনে করে দাদা বললেন—

"আমি প্রায়ই যেতাম সমার্তের ক্যাথিড্রাল সেক্রেকারে। গির্জার চারিদিকে অসংখ্য আর্টিস্টের ভিড়—কারণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গির্জাটির দৃশ্য অপূর্ব, এবং আর্টিস্টরা বসে বসে এক মনে আঁকতেন সে দৃশ্য। শিরালীর সঙ্গে দেখা হওয়ার দিনও চারিদিকে ছিল ছবি আঁকিয়েদের ভিড় আর

আমি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম সে সব। হঠাৎ ভারতীয় চেহারার একটি ছেলেকে দেখে স্বভাবতই আলাপ করতে ইচ্ছে হল।

কথায় কথায় জানতে পারলাম ভারতের হুগলি অঞ্চলে ওর বাড়ি এবং সে বিষ্ণুদিগম্বরের ছাত্র। সংগীতের পাঠ শেষ করে এদেশে এসেছে গবেষণা করতে ওর সেদিনের কথাগুলি আমার আজও মনে আছে। ও বলেছিল 'আমি ভারতীয় সংগীতকে ইউরোপীয় ভাবে রূপান্তরিত করে পরিবেশন করতে চাই।'

সেদিন ওর কথা শুনে আমি বলেছিলাম, তা কেন করবে, ভারতীয় মিউজিক যেমন আছে তেমন থাকতে দাও আর ইউরোপীয় শ্রোতাদের অনুভব করতে দাও সেটাকে।

শিরালী সে দিন চুপ করে শুনলে সে কথা। তারপর যখন আমার সংগে কাজ করছিল তখন হলও তাই। খাঁটি ভারতীয় জিনিসই সর্বদা আমরা উপস্থাপন করতাম বিদেশে। একটা কথা জেনে রাখ অনুপমা, তা যদি আমরা না করতাম তাহলে ইউরোপ আমেরিকার দরজা বন্ধ থাকত আমাদের জন্য। কেননা ওরা যথেষ্ট শিক্ষিত হয় বোঝবার জন্য যে কোনটা খাঁটি ভারতীয় আর কোনটা ইউরোপীয় ভাবাপন্ন।

এক দিক দিয়ে দেখলে শিরালী আমার গুরুভাই। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে গানবাজনার চর্চা ছিল—প্রধানত বাবাই ছিলেন এর পিছনে—এসব বিষয়ে বাবার উৎসাহর গল্প তো আগেই বলেছি। বোম্বাইতে আর্টস্কুলে পড়ার সময় বাবা আমাকে বিষ্ণুদিগম্বরের গানের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। এবং বিলেত আসার আগে বাবার অনুরোধে এই প্রতিষ্ঠান থেকে বেশ কিছু ভারতীয় যন্ত্র আমায় কিনে নিয়ে যেতে হয়েছিল বিলেতে।

যাইহোক এই শিরালী তারপর আমার সংগে যোগ দেয় এবং বহুদিন কাজ করে। আমার 'কল্পনা' ছবির সংগীত পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন শিরালী।

শিরালীজী বা তিমিরবরণ এদের প্রসংগে দাদা বলে,'এরা শুধু যে আমার সংগে কাজ করেছে দলের কর্মী হিসাবে এবং আমি সেই দলের পরিচালক তা নয়–এরা আমার বন্ধুর মতো। এদের মধ্যে সংগীত পরিচালকের গুণ ছাড়াও এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যার জন্য আমি তাদের সর্বদা শ্রদ্ধা করতাম।'

শিরালীজীর বিষয়ে দাদার কাছে শুনেছি, শান্ত স্বভাবের এই লোকটি কি অপূর্ব দক্ষতার সংগে কাজ করতেন। ভাব এবং লয়ের জ্ঞানে শিরালীজীর তুলনা নেই। শিরালীজী যখন বিদেশে থেকে দাদার সংগে সহযোগিতা করে চলেছেন, তখন তাঁর বাবা মা ভাই বোন ছিলেন দেশে। দেশে ওঁদের

> বিষ্ণুদাস শিরালীর হাতেই গড়ে ওঠে তবলাতরংগ।
>
> * * *
>
> প্যারিসে তিমির সরোদ বাজাচ্ছে। ভারততত্ত্ববিদ সিলভা লেভি সোফা ছেড়ে গালিচার ওপর সজল চোখে এগিয়ে বসলেন।

অবস্থা খুব স্বচ্ছল নয় তাই তরুণ শিরালীজী বিদেশে উপার্জিত অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন বাবা মাকে। ভাই এর শিক্ষা, বোনের বিবাহ সবই তাঁর অর্থে হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিদেশে এক অতি সংযত জীবন যাপন করতেন তিনি। নিরামিষাশী এই ব্রাহ্মণ তরুণটিকে সে সময় তারই সমবয়সী দলের অন্যছেলেরা তার খাওয়া দাওয়া নিয়ে এবং মিতব্যয়িতা নিয়ে উপহাসও করেছেন; কিন্তু দাদা লক্ষ্য করেছেন যে একদিনের জন্যও মনে কোন অসন্তোষ বা বিরূপ মত পোষণ করা নয়, কারও বিরুদ্ধে কোন নালিশ নয় শুধু কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন শিরালীজী।

কাজের প্রতি নিষ্ঠা আর খোলামনই শিরালীজীকে সাফল্যের দরজায় পৌঁছে দিয়েছে। 'কল্পনা'র সংগীত পরিচালনার দায়িত্বের পর শিরালীজী ফিল্ম ডিভিসনের কাজে যোগ দেন।

আজকাল তবলাতরংগ সকলের কাছেই খুব পরিচিত। দাদা যখন হিন্দু কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র তখন একবার বিষ্ণুদিগম্বর তাঁর দক্ষ ছাত্রদের নিয়ে সংগীত পরিবেশন করেন বারাণসীর 'বাঁশ-পটকা'য়।

একটি গান দাদার আজও মনে আছে—'আই-ই বাদরিয়া বরষণ হারি।' ছাত্রদের মধ্যে সকলের হাতে এক একটি বিশেষ সুরে বাঁধা এক একটি তবলা। তারা গানটির সুরের সংগে মিলিয়ে মিলিয়ে নিজের নিজের তবলায় আওয়াজ করছেন এবং এক একজনের হাতে এক একটি সুরে বাঁধা তবলা মিলিতভাবে যেন একটি সুরেলা যন্ত্রের মতো কাজ করছে। এ উনিশশ' তেইশ-চব্বিশ সালের কথা এবং সে সময় দাদার বয়স ঐ তের কি চোদ্দ বছর—সেই বয়সেই তাঁর মাথায় একটা চিন্তা এসেছিল যে সুরে বাঁধা তবলাগুলিকে পরপর সাজিয়ে একটা যন্ত্রের পর পর বাঁধা ঘাটগুলির মত করে বাজালে ও একটি লোক যদি তা বাজায় তাহলে কেমন হয়? সে যন্ত্রের কি নাম হবে—তবলাতরংগ?

বিষ্ণুদাস শিরালীজীকে দিয়ে দাদা প্রথম তবলাতরংগ বাজানোর প্রচেষ্টা করেন এবং বিরাট সাফল্যের মধ্য দিয়ে সে প্রচেষ্টা সফলও হয়—প্রচলন হয় তবলাতরংগের।

দাদার সংগে যুক্ত থাকাকালীন শিরালীজীই একমাত্র লোক যিনি দৈনন্দিন অনুষ্ঠানের বিবরণ লিখে রেখেছিলেন।

ভাগ্যিস তিনি সে কাজ করেছিলেন আজ তাই তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে সেই তালিকা।

তিমিরবরণ

দাদার প্রথম সংগীত পরিচালক তিমিরবরণের সংগে দাদার প্রথম আলাপ হয় কলকাতাতে উনিশ শ' ত্রিশ সালের গ্রীষ্মকালে হরেন ঘোষ মহাশয়ের মাধ্যমে।

এশিয়াটিক সোসাইটি হলে কীভাবে কোন পরিবেশে সাক্ষাৎ হয় তা আমরা আগেই জেনেছি।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সুযোগ্য শিষ্য সরোদ শিল্পী শ্রী তিমিরবরণ ভট্টাচার্য তাঁর সংগীত প্রিয়তার জন্য মনেপ্রাণে তাঁর অগ্রজ মিহিরকিরণের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের তিন ভাইয়ের একসংগে গানবাজনার চর্চা তাঁদের এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধেছিল। এই মিহিরকিরণের অনুমতি পেয়েই তিমিরবরণ যোগদিয়েছিলেন উদয়শংকরের সম্প্রদায়ে। পরবর্তীকালে তিমিরবরণের কনিষ্ঠভ্রাতা শিশিরশোভনও যোগ দেন দাদার দলে।

সব আকর্ষণ তুচ্ছ করে তিমিরবরণ যাত্রা করেন ইউরোপে দাদার সংগে ছয় বৎসরের চুক্তিতে।

মাতৃভূমি থেকে আমি যখন বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি তখন এখানকার তথাকথিত শিক্ষিত সংগীতজ্ঞ সমাজ প্রচুর অপ্রিয় মন্তব্য শুরু করে দেয়। তাদের দারুণভাবে বিরূপ মত ছিল যে বাইরে হিন্দু মিউজিক কেউ নেবে না। পশ্চিমের শ্রোতারা রস গ্রহণই করতে পারবে না আমাদের শাস্ত্রীয় নিয়মবন্ধ মিউজিকের।

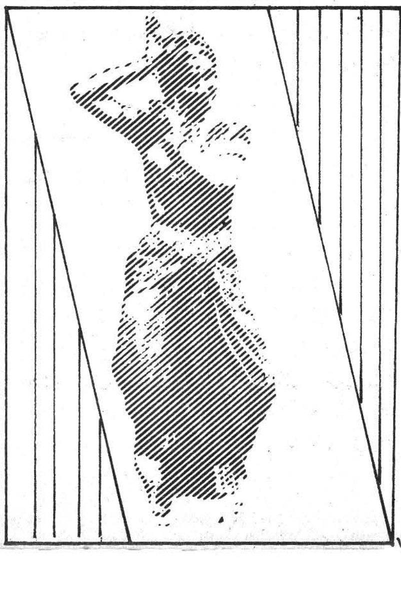

ভারতে গুপ্তচর চক্রের আসল নায়ক কে ?

সাম্প্রতিক গুপ্তচরবৃত্তির ঘটনায় যে সমস্ত পরস্পরবিরোধী এবং ভয়াবহ তথ্য এখন পর্যন্ত জানা গেছে তাতে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে মূল নায়ক বলে বর্ণিত এস এল মানেকলালা কোম্পানীর যোগেশ মানেকলাল বা তার দিল্লিস্থ লিয়াঁস অফিসার কুমার নারায়ণ প্রকৃত নায়ক নয় – সমস্ত ঘটনার পশ্চাতে রয়েছে অন্য কোন অতি সুদক্ষ, কৌশলী, অভিজ্ঞ এবং প্রভাবশালী কোন বিদেশী বা দেশী গোষ্ঠী বা ব্যক্তিরা। যে রকম সুকৌশলে এই ষড়যন্ত্রের জাল ধীরে ধীরে বিছানো হয়েছে এবং যেভাবে বেছে বেছে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবালয়ে, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে, প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারীর দপ্তরে এবং ভারতের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে দপ্তরে ব্যপকভাবে গুপ্তচরদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে বা নিয়োগ করা হয়েছে তা কেবলমাত্র যোগেশ মানেকলাল বা কুমার নারায়ণের একক প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব নয়। কোন কোন অভিজ্ঞ মহলের ধারণা এদের দুজনকে শিখন্ডী খাড়া করে পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ানো হয়েছে যদিও সব কিছু গোপন খবরাখবর এদের মাধ্যমেই বিদেশী চক্রের হাতে গিয়ে পৌঁছেছে। এদের দুজন ছাড়া অন্য যাদের ধরা হয়েছে তাদের বেশীর ভাগই হচ্ছে বিভিন্ন দপ্তরের প্যার্সোন্যাল এ্যাসিসটেন্ট এবং লুধিয়ানার আগ্রওয়াল এবং জয়েদকা নামক দুজন উঠতি ব্যবসায়ী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শ্রীমতী গান্ধীর জীবদ্দশাতেই বন্ধুভাবাপন্ন দেশের গোয়েন্দা সূত্র থেকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর যে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে এমন খবর জানানো হয়েছিল। এই সঙ্গে একথাও জানান হয় যে শ্রীমতী গান্ধীকে হত্যার এক গূঢ় ষড়যন্ত্র চলছে। অবশ্য এ সংবাদ ভারতীয় নিজস্ব গোয়েন্দা সূত্রেও পাওয়া গিয়েছিলো।

এখন প্রশ্ন যে কে বা কারা প্রকৃত পক্ষে এই ষড়যন্ত্রের জাল বুনছিলো এবং গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি থেকে গোপন সংবাদ সংগ্রহে আগ্রহী হয়েছিলো ? এ ব্যাপারে বহু নিন্দিত আমেরিকান সি আই এর সঙ্গে ভারতের বন্ধুভাবাপন্ন দেশ রাশিয়ার কেজিবির নামও সমভাবে উল্লেখিত হয়েছে। ধৃত ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি থেকে জানা গেছে যে এই সব গোপন সংবাদ ন্যাটো গোষ্ঠী ভুক্ত বিভিন্ন দেশগুলির সঙ্গে ওয়ারশা চুক্তি ভুক্ত দেশগুলিও সংগ্রহ করে আসছিলো। অর্থাৎ এক কথায় ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছিলো বিদেশী গুপ্তচর চক্রগুলির এক অবাধ এবং স্বচ্ছন্দ বিচরণ ক্ষেত্র।

গুপ্তচরচক্রের ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে আপাতত বিদেশী কূটনীতিবিদদের মধ্যে ফরাসি ডেপুটি মিলিটারি এ্যাটাচি লেঃ কর্ণেল বেইলিকে ভারত ছাড়তে হয়েছে। কারণ এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল সুস্পষ্ট এবং কর্ণেল বেইলির গোপন সংবাদ সংগ্রহের মূল সূত্রই ছিল কুমার নারায়ণ। কিন্তু তবু মূল প্রশ্ন রয়ে যায় যে কর্ণেল বেইলী প্রকৃত পক্ষে কার হয়ে ভারতে কাজ করছিলো ? ফরাসি

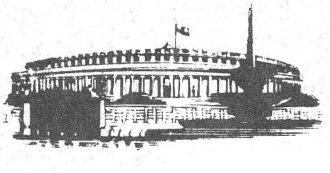

রাজধানীর কড়চা

অমৃত কুমার

সরকার এ ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি যাতে না ঘটতে পারে – বিশেষত ভারতের সঙ্গে এক বিপুল অঙ্কের 'মিরাজ ডিল'-এর মুহূর্তে সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেল বেইলীকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন যে কর্ণেল বেইলির প্রকৃত ভূমিকা নিয়ে তাঁরা অনুসন্ধান করবেন এবং জানিয়েছেন যে ফরাসি সরকার এই ব্যাপার সম্পর্কে একেবারেই অবহিত নন।

ফরাসি সরকার বেইলীর কার্যকলাপ সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করলেও এক ফরাসি সংবাদপত্রের সংবাদ সূত্র থেকে জানা যায় যে ফরাসি ইনটেলিজেন্স সারভিসের এশীয় বিভাগ যে গুপ্তচর চক্র পরিচালনা করেন কর্ণেল বেইলী তার একজন সক্রিয় সদস্য।

তাহলে বেইলী কি তাঁর নিজের দেশের হয়েই মুখ্যত গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে আসছিলো ? শোনা যাচ্ছে যে কর্ণেল বেইলির খদ্দেরদের মধ্যে সি আই এ এবং কে জি বিও নাকি ছিল। পরস্পরবিরোধী এবং গোলমেলে নানান তথ্যের জট না খুললে বেইলির প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে জানা যাবে না।

সি আই এ যে বহুদিন ধরেই ভারতে গুপ্তচরবৃবতি করে আসছে এবং ভারতের নানান অভ্যন্তরীণ সমস্যা সৃষ্টিতে ইন্ধন জোগাচ্ছে একথা সর্বজনবিদিত। তবে ভারতে কে জি বির ভূমিকা সি আই এর মত অতটা পরিষ্কার নয়। সম্ভবতঃ ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যতার জন্যই কে জি বির কার্যকলাপ সম্পর্কে একটা ঢাকঢাক গুড়গুড় মনোভাব অবলম্বন করা হয়েছে। তবে জনতা দলের আইনজীবী এবং শ্রীমতী গান্ধীর হত্যাকারী সতম্নন্ত সিং-এর কৌশলী (এই জন্যে তিনি দল থেকে পদত্যাগ করেছেন বলেও শোনা যাচ্ছে) পি এন লেখি দিল্লী হাইকোর্টে এক পিটিশনে বিভিন্ন দেশ থেকে গুপ্তচরবৃত্তির বেশ কজন সোভিয়েত কূটনীতিবিদের নাম করে বলেছেন যে তাঁরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সোভিয়েত মিশনে বর্তমানে কাজ করছেন। অভিযোগ সত্যি হলে নিঃসন্দেহে তা চিন্তার বিষয়।

গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় গোপন খবর যে সম্প্রতি সি আই এর হাতে নিয়মিত গিয়ে পড়ছে সে খবর ভারতীয় কাউন্টার ইনটেলিজেন্স বিভাগের নজরে আসে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার দুই সংবাদ পত্রে প্রকাশিত আমেরিকান সেনেটের ইনটেলিজেন্স কমিটির কাছে সি আই এর এক গোপন প্রতিবেদনের সংবাদ থেকে। উল্লেখ্য যে ঐ কমিটির সভাপতি ছিলেন ব্যারি গোল্ডওয়াটার এবং তাঁর ডেপুটি সেনেটর প্যাটরিক মইনিহান।

ভারতের যে টপ সিকিউরিটি নোটটি সেনেট কমিটির কাছে সি আই এ পেশ করেছিলো সেটি ১৯৮২তে ইরাকের অসির‍্যাক রি এ্যাকটারের ওপর ইসরাইল যে ধরনের বিমান হানার দ্বারা তা চালু হবার একদিন আগেই ধ্বংস করে দেয়, পাকিস্তানের পারমাণবিক ক্ষেত্র কাহুটায় সেই ধরণের একটি ভারতীয় বিমান আক্রমণের প্রস্তাব। শ্রীমতী গান্ধীর কাছে এই প্রস্তাবটি রেখেছিলেন তাঁর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টারা। এ প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি এবং শ্রীমতী গান্ধী কর্তৃক সেই সুপারিশকে নাকচ করে দেবার নোটিং-এর প্রতিলিপি সি আই এ ঐ সভায় পেশ করে। কুমার নারায়ণের মাধ্যমে সি আই এ ঐ গোপন নোটটি পেয়েছিল বলে পরে অনুমান করা হচ্ছে।

সম্ভবতঃ ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করতে ঐ গোপন কমিটির আলোচ্য বস্তু

নিউইয়র্ক টাইমস এবং ওয়াশিংটন পোস্টে ইচ্ছে করেই ফাঁস করে দেওয়া হয়। সেনেট কমিটির মিটিং-এর কয়েক সপ্তাহ পরেই এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরে আমেরিকা সরকার এই সংবাদ সূত্র সম্পর্কে সি আই এর ভূমিকা ভারতীয় কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে বুঝতে পেরে সাফাই গাইবার চেষ্টা করে বলে যে ইউ এস পর্যবেক্ষণ স্যাটেলাইট ভারতীয় বিমান বাহিনীর ২ স্কোয়াড্রন জাগুয়ার বিমানকে তাদের নিজস্ব অবস্থান ক্ষেত্রে দেখতে না পেয়ে অনুমান করে সম্ভবতঃ পাকিস্তানের পারমাণবিক ক্ষেত্রে সম্ভাব্য এক বিমান হানার জন্য তাদের পশ্চিমাঞ্চলের কোন ভারতীয় বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আমেরিকান সরকার তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করলেও ভারতীয় কাউন্টার ইনটেলিজেন্স বিভাগের কাছে অতি গোপনীয় নোটিং সি আই এর হাতে ফাঁস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আর চাপা থাকেনি। যদিও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এ ধরনের কোন নোট-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। তবে এই ঘটনা ভারতে সক্রিয় চরচক্র সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে তাদের প্রবৃত্ত করে। কাজেই গুপ্তচর বৃত্তিতে সি আই এর ভূমিকা আবার নতুন করে প্রমাণিত হল।

কুমার নারায়ণ যে স্বীকারোক্তি দিয়েছে তাতে সে জানিয়েছে যে কেবল কর্ণেল এলেন বেইলিই নয়, ইস্ট জার্মান এবং পোলিশ দূতাবাসের ডেপুটি কমারশিয়াল এ্যাটাচীদেরও সে তথ্য সরবরাহ করতো। কুমার নারায়নের সহযোগী লুধিয়ানার দুই ব্যবসাদার আগ্রওয়াল এবং জাইদকাও স্বীকার করেছে রাশিয়ায় গোপন তথ্য সরবরাহের পুরস্কার স্বরূপ তারা মোটা অঙ্কের হোসিয়ারী ব্যবসা যোগাড় করতে সমর্থ হয়েছে এবং বাণিজ্য মন্ত্রকের টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টের করণিক এইচ এন চতুর্বেদী তাদের সংবাদ পাবার মূল সুত্র ছিল। এ সংবাদের সত্যতা কুমার নারায়ণও স্বীকার করেছে। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল যে আগ্রওয়াল এবং জয়েদকারের ব্যবসা কেবলমাত্র আবার সোভিয়েত ইউনিয়নেই সীমাবদ্ধ ছিল না – তার বিস্তৃতি ছিল ওয়েস্ট ইউরোপীয় দেশ এবং আমেরিকাতেও। তাদের একজন একথাও স্বীকার করেছে যে সোভিয়েত দূতাবাসের একজন নীচু পদমর্যাদাসম্পন্ন ট্রেড কাউন্সিলের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল।

উল্লিখিত এই তথ্যের ভিত্তিতে একথা পরিষ্কার যে উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন থাকলেও বিভিন্ন দেশ ভারতে গুপ্তচর বৃত্তিতে বিশেষভাবেই সক্রিয় ছিল। ভারতের মূল প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দ্রব্যাদি এযাবৎ প্রধানতঃ সরবরাহ করে আসছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ান। এখন ফরাসী সরকার তার একটা প্রধান ভাগীদার হতে চলেছে। ফরাসী প্রতিরক্ষা দ্রব্যাদি সম্পর্কে এবং এ ব্যাপারে ভারতের প্রকৃত মনোভাব জানবার জন্যে সম্ভবতঃ কে জি বি কর্নেল বেইলি বা কুমার নারায়ণের সূত্র ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়েছিলো। ভারত থেকে অবাধে যে গোপন তথ্যাদি বিনাবাধায় দেশে দেশে সহজেই পাচার হয়ে যাচ্ছে এ খবর সি আই এ এবং কে জি বি উভয়েরই জানা ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আমেরিকা উচ্চ প্রযুক্তিগত জ্ঞান ভারতে সরবরাহ করতে এযাবৎ কাল অনিচ্ছুক ছিল সম্ভবতঃ এই কারণেই যে তা সহজেই কে জি বির হাতে চলে যাবে বলে। (অতি সম্প্রতি এ ব্যাপারে ভারত-আমেরিকার মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে)।

উল্লিখিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে একটা জিনিস পরিষ্কার যে বিদেশী গুপ্তচর চক্র সবদিক থেকে নজর রেখে খুব কৌশলে কুমার নারায়ণ এবং যোগেশ মানেকলালকে বেছে নিয়েছিলো। কারণ ব্যবসার খাতিরে কুমার নারায়ণ প্রথমে বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে তার কোম্পানীর জন্য ব্যবসায়িক সংবাদ জোগাড় করা দিয়ে তার গুপ্তচর জীবনের শুরু করেছিলো। প্রথমে সে ছিল বাণিজ্য মন্ত্রকের সামান্য একজন করণিক এস এল এম মানেকলাল কোম্পানির যোগেশ মানেকলাল কেন তাকে চাকরী ছাড়িয়ে নিজের কোম্পানীতে নিয়ে আনলো? বিভিন্ন দপ্তরের নীচু তলার সরকারী কর্মীদের সঙ্গে তার যোগসূত্রের জন্যে নাকি বিশেষ কারুর নির্দেশে?

মানেকলাল কোম্পানী প্রথমে টেক্সটাইল মেশিনারী প্রস্ততকারী হিসাবে ব্যবসা জগতে প্রবেশ করে। মাঝখানে বছর ২ বা ৩ তার ব্যবসায় খুব মন্দা থাকলেও গত ৪ বা ৫ বছরে তার ব্যবসা আবার হঠাৎ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। পুরানো ব্যবসা ছেড়ে তারা ক্রমেই বিভিন্ন সর্বাধুনিক ইন্ড্রাসট্রিয়াল গুডসএর সরবরাহ করতে শুরু করে। ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে ভারতের কতিপয় রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার বেশ কয়েক কোটি টাকার অর্ডার তাদের হাতে। সম্প্রতি তারা আবার সমুদ্রতীরবর্তী তৈল নিষ্কাশন এর কাজে এগিয়ে এসে সমুদ্রতীরবর্তী তৈল নিষ্কাষণের ব্যাপারে অভিজ্ঞ আমেরিকার এক প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও এন জি সিতে কয়েক কোটি টাকার টেন্ডার দাখিল করেছে। এছাড়া মানেকলাল কোম্পানী বেশকিছু বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসায়িক কারণেও চুক্তিবদ্ধ।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় ব্যবসা বাজারে মন্দার সময় কি মানেকলাল কোম্পানী বিদেশের চক্রের প্রলোভনের ফাঁদে পা দেয়। নাকি তার আগে থেকেই তারা ব্যবসার স্বার্থে বিদেশী চক্রের কাছে সংবাদ লেনদেন করে আসছে। মানেকলাল কোম্পানীর এই বহুবিধ ব্যবসায়িক সম্প্রসারনের কারণ কি বিদেশী প্রভূদের পুরস্কার? কোম্পানীর বিদেশী প্রভূরাই কি পেছন থেকে কুমার নারায়নের গুপ্তচর চক্র পরিচালনায় মদত জুগিয়েছে বা নির্দেশ দিয়ে এসেছে? মানেকলালের কি কোন প্রভাবশালী ভারতীয় মুরুব্বীও ছিল?

যোগেশ মানেকলাল নাকি তার স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছে যে তার অতি পরিচিত জনের মধ্যে আছেন একজন প্রাক্তন জাহাজ ও পরিবহন মন্ত্রী, জনৈক প্রাক্তন বাণিজ্য মন্ত্রী এবংএকজন প্রাক্তন ও জনৈক বর্তমান আই এ এস অফিসার যিনি আবার বিদেশে কিছুদিন কর্মরত ছিলেন। ব্যবসায়িক সূত্রে হয়ত তাঁদের সঙ্গে যোগেশ মানেকলালের যোগাযোগে হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় তা সত্যি হলে এই যোগাযোগ কোন পর্যায়ে এবং কতখানি ছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখ না করলে সমস্ত ব্যাপারটার জটিলতা বুঝতে পারা যাবে না। কুমার নারায়ণ দিল্লির অভিজাত জিমখানা ক্লাবের সদস্য হবার জন্যে অনেক দিন ধরে চেষ্টা করে আসছিলো। যতদূর জানা গেছে তা হল প্রায় ২ বছরের প্রচেষ্টার পর ১৯৮১ সালে কুমার নারায়ণ দিল্লীর জিমখানা ক্লাবের সদস্য হতে সমর্থ হয়। দিল্লীর জিমখানা ক্লাব খুবই একটি অভিজাত ক্লাব। এবং এখানের সদস্য হতে পারেন মন্ত্রী, অতি উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার (জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং তার উপরে র‍্যাঙ্কে) বিদেশী দূতাবাসের সদস্যেরা এবং খুবই প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ অফিসারের। তাই এহেন জিমখানা ক্লাবে কুমার নারায়ণ সদস্য হয়েছিলেন কি তার যোগাযোগের পরিধির বিস্তার করতে ও বড় মহলে এবং বিশেষ করে বিদেশী দূতাবাসের কর্মীদের সঙ্গে তার মেলামেশা গোয়েন্দা বিভাগের যাতে সন্দেহের কারণ না ঘটায় তার জন্যে?

আর একটা বিষয় খুব পরিষ্কার নয় এবং যথেষ্ট সন্দেহ উদ্রেকের কারণ। তা হল কুমার নারায়ণের হেলী রোডের অফিসে সংবাদ দেওয়া নেওয়ার জন্য যাঁরা আসতেন বলে জানা গেছে সেই সব ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে সবাই প্রায় বিভিন্ন দপ্তরের প্যার্সোন্যাল এসিসটেন্ট। যেমন প্রধান মন্ত্রীর প্রিন্সিপ্যাল

সেক্রেটারি পি সি আলেজাণ্ডারের ব্যক্তিগত সচিব টি এন খের – ঐ অফিসের অপর দুজন ব্যক্তিগত সচিব পি এ পি গোপালন এবং কে মালহোত্রা ইকনমিক এ্যাফেয়ার দপ্তরের পি এ তিওয়াড়ী, রাষ্ট্রপতির প্রেস সেক্রেটারীর পি এ এস শঙ্করণ, প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তরের ব্যক্তিগত সচিব জগদীশ আরোরা এবং বাণিজ্য মন্ত্রকে করণিক এইচ এন চতুর্বেদী। এদের মধ্যে টি এন খেরের দিল্লির পাল্মোস কলোনিতে নিজস্ব একটি দোতলা বাড়ি রয়েছে। গোয়েন্দা সূত্র থেকে জানা গেছে যে আর্থিক দিক থেকে অন্যারা তেমন কেউ স্বচ্ছল নয় বিশেষত এই ধরণের গুপ্তচর বৃত্তির ব্যাপারে সচরাচর যে বিপুল অর্থের লেনদেন ঘটে সেই অনুপাতে।

সামান্য কিছু অর্থ, বিদেশী মদ এবং মনোরঞ্জনের জন্য কুমার নারায়ণের নিয়োজিত নারীসঙ্গের টোপে তারা এই ধরনের বড় একটা ঝুঁকি নিয়েছিলেন কেন? তবে কি তাদের গুপ্তচর বৃত্তিতে প্রথমে কৌশলে সামিল করে কুমার নারায়ণ এক ধরনের পরোক্ষ ব্ল্যাক মেলিং-এর সাহায্যে গোপন সংবাদ সরবরাহে বাধ্য করেছিলো? সম্পূর্ণ তদন্ত না হলে প্রকৃত তথ্য জানা যাবে না। তবে গোপন তথ্য পাচারের বিনিময়ে তারা যে সামান্য পরিমাণ অর্থ পেয়ে আসছিলো তাতে এই ধরনের বড় একটা ঝুঁকি তারা স্বেচ্ছায় নিয়েছিলো তা বিশ্বাস করা কষ্টকর।

হেলী রোডে মানেকলাল কোম্পানীর বাড়িতে এইসব ব্যক্তিগত সচিবদের মনোরঞ্জনের জন্য মহিলাদের আনাগোনাও নিয়মিত হত বলে জানা গেছে। কিন্তু কুমার নারায়ণের হয়ে কাজ করেএমন যে ২/৪ জন মহিলার নাম জানা গেছে তাতে বিশ্বাস করা শক্ত যে উচচ যোগাযোগসম্পন্ন এবং খুবই বেশী দামী ঐ সব মহিলাদের কেবলমাত্র চুনোপুঁটি কিছু ব্যক্তিগত সচিবদের মনেররঞ্জনের জন্য কুমার নারায়ণ নিয়োগ করেছিলো।

কুমার নারায়ণের রিক্রুট এক মহিলা প্রথমে দক্ষিণ দিল্লীর এক হোটেল ব্যবসায়ীর পুত্রের প্রকাশিত এক ইংরাজী পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি ছিলেন।

অপর একজন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সুন্দরী মহিলা ভারতে জনৈক মধ্যপ্রাচ্যের এক দেশের কূটনীতিবিদের রক্ষিতা হিসাবে ২ বা ৩ বছর কাটিয়েছেন। ঐ কূটনীতিবিদ ভারত ছেড়ে চলে গেলে মহিলা এক পাঁচতারা হোটেলে ক্যাবারে নৃত্যশিল্পী হিসাবে যোগদান করে। বিদেশী কূটনীতিবিদের সঙ্গে বসবাস করার সময় ঐ মহিলার সঙ্গে উঁচু পর্যায়ের নানান কূটনীতিবিদ, সরকারী আমলা এবং ব্যবসায়ীদের ভাল চেনাজানা হয়। মহিলার গুণের অন্ত নেই। দিল্লীর এক পাঁচতারা হোটেলর এক দোকান থেকে বহু টাকার গহনা চুরির কেসে জনৈকা জার্মান এবং ফরাসী ব্যক্তির সঙ্গে তিনিও জড়িয়ে পড়েন। উল্লেখযোগ্য ঐ জার্মান এবং ফরাসী ব্যক্তিদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য ইন্টার পোল অনেকদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। মহিলা অবশ্য ওপর মহলের সঙ্গে তার ভাল যোগাযোগের জন্য ছাড়া পেয়ে যায়। এর পরেই নাকি কুমার নারায়ণ তাকে নিজের খপ্পরে নিয়ে আসে।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসে এই ধরনের ব্যয়সাধ্য মহিলাদের কুমার নারায়ণ কাদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রচুর অর্থ দিয়ে নিয়োগ করেছিলো? তবে কি কুমার নারায়ণের মেহেরলীর ফার্ম হাউসের নির্জনে কোন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনের জন্যে তাদের ব্যবহার করা হত। কুমার নারায়ণের স্ত্রী গীতা নারায়ণ তাদের মেহেরলীর বাড়িতে এই ধরনের কোন পার্টির আয়োজন করা হত এ কথা অস্বীকার করলেও জানা গেছে তা সত্য নয়। তবে ঐ সব পার্টিতে কাদের মনোরঞ্জন করতো কুমার নারায়ণ?

অতএব দেখা যাচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটাই এক গভীর রহস্যে ভরা রয়েছে। রহস্যের জাল আদৌ উন্মোচিত হবে কিনা জানি না তবে হলে এব্যাপারে হয়ত বিষদে সবকিছু জানা যাবে। তবে উল্লিখিত ঘটনার বিশ্লেষণে একথা পরিস্কার যে ভারতের এই গুপ্তচরবৃত্তির আসল নায়ক যোগেশ মানেকলাল বা কুমার নারায়ণ নয়। তাই খুঁজে দেখা দরকার 'অন্য কোথা অন্য কোনখানে?' □

হাজার হাজার বেকার যুবকের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা

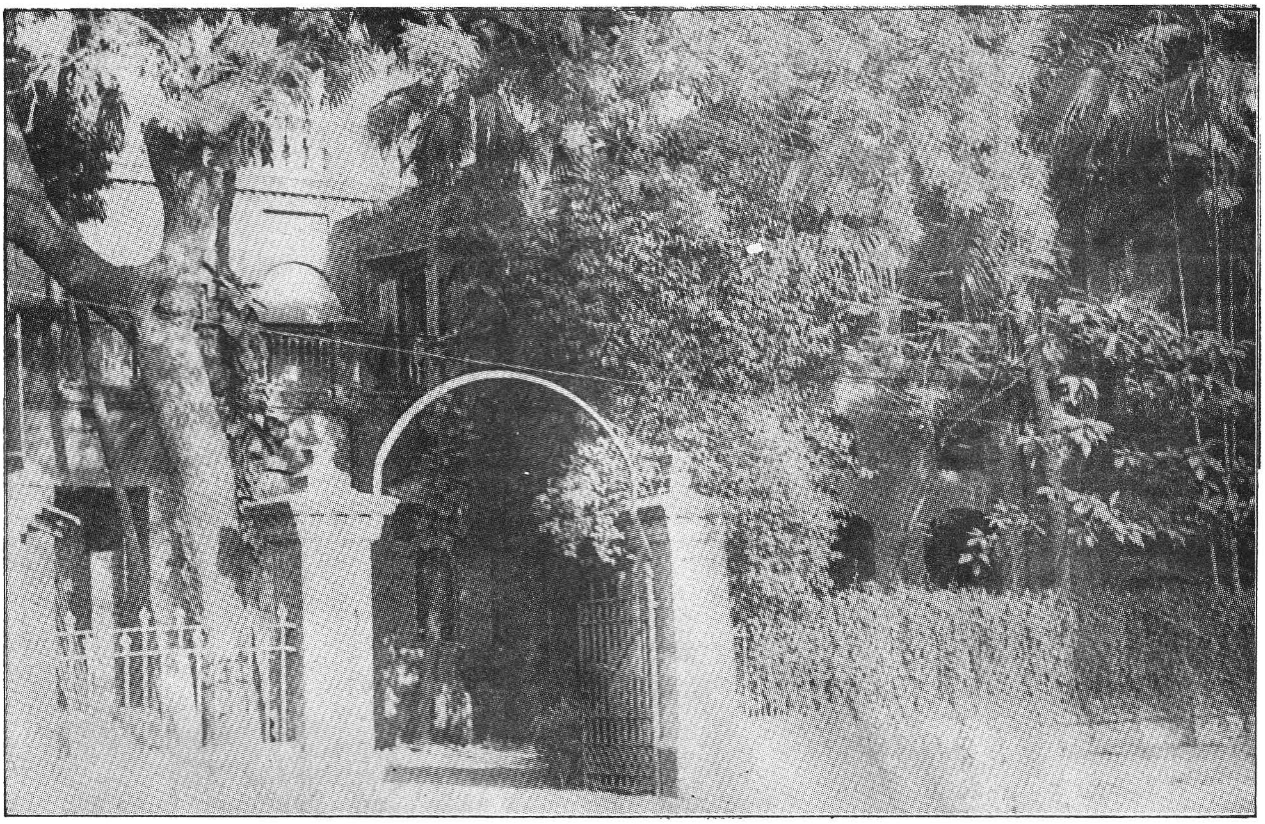

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ দপ্তরের লাইসেন্সিং বোর্ড দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে বন্ধ থাকায় হাজার হাজার বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই বোর্ড কেন বন্ধ এবং কবে খুলবে এই প্রশ্ন নিয়ে কয়েক দিন আগে হাজির হয়েছিলাম ১নং হরিশ মুখার্জি রোডে ডাইরেকটোরেট অব ইলেকট্রিসিটির অফিসে। এই অফিসেই আছে লাইসেন্সিং বোর্ড।

মুখ্য বিদ্যুৎ পরিদর্শক শংকর কুমার কুন্ডুকে প্রশ্ন করা হলে বোর্ডের কাজকর্ম কবে চালু হবে তার কোন সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি। তবে জানা গেছে যে ইনজাংশন জারি হওয়ায় বোর্ডের কাজকর্ম বন্ধ আছে। ফলে হাজার হাজার যুবকের কর্ম সংস্থানের পথ যেমন রুদ্ধ তেমনি সরকারের বছরে লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্বেরও ক্ষতি হচ্ছে।

এদিকে রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী এবং বিদ্যুৎ সচিব, বোর্ড চালু করে কর্ম সংস্থানের পথ প্রশস্ত করতে কতখানি তৎপর তা বোর্ডের প্রায় তিন বছর বন্ধ থাকাটা থেকেই বোঝা যাবে। যদি তারা হাজার হাজার বেকারের মুখ চেয়ে সত্যি সত্যি সচেষ্ট হতেন তাহলে বোর্ড এতদিন ধরে বন্ধ থাকত না বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা।

শংকরবাবু জানালেন, গত ৮২ সালের জুন মাস থেকে এই লাইসেন্সিং বোর্ডের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে আছে। আদালতের ইনজাংশনের ফলে বোর্ড কোন কাজ করতে পারছে না। তিনি জানালেন, বোর্ডের লাইসেন্সের সঙ্গে কর্মসংস্থানের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখান থেকে বিদ্যুতের কাজে পারদর্শী ব্যক্তিদের পরীক্ষা নিয়ে বিভিন্ন লাইসেন্স দেওয়া হয়। যেমন ওয়ার্কমেন পারমিট, সুপারভাইজারি কর্মপিটেন্সি সার্টিফিকেট, ন্যাশানাল সার্টিফিকেট অব সুপারভাইজারি, ইলেকট্রিক্যাল কনট্রাকটরি লাইসেন্স, লিফট অপারেটার্স সার্টিফিকেট প্রভৃতি। এখান থেকে লাইসেন্স নিয়ে ছেলেরা বিভিন্ন সংস্থায় চাকরী পান। সরকারী আইন আছে, বিদ্যুতের কাছে লাইসেন্সহীন লোক নিয়োগ বৈধ নয়। যেমন সরকারের কাছ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স না নিয়ে কেউ গাড়ি চালাতে পারেন না তেমনি এখান থেকে লাইসেন্স না নিয়ে কোনো লোক বিদ্যুতের কাজ করতে পারেন না অন্যথায় যদি কোন দুর্ঘটনা হয় তাহলে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ে সংস্থার মালিকের উপর। এই কারণেই নিয়োগকর্তারা লাইসেন্সহীন লোক নিতে চান না। যার জন্য এই লাইসেন্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বোর্ড বন্ধ থাকায় স্থানীয় ছেলেরা অসহায় হয়ে পড়েছেন। তার কয়েকটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দিয়ে তিনি জানালেন, ইস্টার্ণ কোল ফিল্ডের প্রায় ২০০ জন যুবকের চাকরি পাকা হচ্ছে না লাইসেন্স না থাকায়। এরকম বেশ কিছু যুবক আছেন ইসকো কারখানায়। অয়েল এ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের সাতটি কেস আছে, যাদের সুপারভাইজারি লাইসেন্স থাকলে চাকরীতে নিয়োগ করা হবে। এখান থেকে লাইসেন্স পেলে যেমন চাকরির সুযোগ পাওয়া যায় তেমনি কনট্রাকটরি লাইসেন্স নিয়ে বহু ছেলেকে আবার কাজও দেওয়া যায়। যেমন ধরুন একজন বেকার ইঞ্জিনিয়ার এখান থেকে কনট্রাকটরি লাইসেন্স পেলেন এবং একটি কনট্রাকটরি ফার্ম খুললেন। সেখানে তিনি আবার কয়েকজনকে চাকরি দিলেন। একটি কনট্রাকটরি ফার্মে একজন লাইসেন্সিয়েট সুপারভাইজার সহ অন্ততপক্ষে তিনজন লোকের দরকার। শুধু লাইসেন্স প্রাপ্ত লোকই নয়, কনট্রাকটরি সংস্থা বড় হলে সেখানে করনিক, পিওন প্রভৃতি লোকেরও দরকার হয়ে পড়ে। ফলে লাইসেন্স প্রাপ্ত লোক যেমন কাজ পাবেন তেমনই অন্যান্য সাধারণ যুবকরাও কিছু কিছু কাজ পাবেন। সুতরাং বোর্ড বন্ধ

থাকায় কর্ম সংস্থানের পথও সংকুচিত হচ্ছে।

অপরদিকে এই বোর্ড বন্ধ থাকায় ভিন রাজ্যের যুবকদের সুবিধে হচ্ছে। অন্যান্য রাজ্যে বিদ্যুতের লাইসেন্সিং বোর্ড তো আর বন্ধ নেই। সেখান থেকে তাঁরা লাইসেন্স নিয়ে এখানে আসছেন এবং বিভিন্ন সংস্থায় তাঁরা কাজও পেয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের সুবিধে হল এই রাজ্যের বোর্ড বন্ধ থাকায় স্থানীয় ছেলেরা আবেদনই করতে পারছেন না লাইসেন্স না থাকায়। তাঁরা নিজেদের রাজ্যের সুযোগ তো পাচ্ছেনই উপরন্তু এই রাজ্যের সুযোগগুলিও নিজেদের কাজে লাগাচ্ছেন। অনুরূপভাবে বিদ্যুতের কাজে টেন্ডার ডাক৷ ২০ স্থানীয় আবেদনকারীর সংখ্যা যথেষ্ট নগণ্য। বোর্ড বন্ধ থাকায় স্থানীয় যুবকেরা মার খাচ্ছেন, উপকৃত হচ্ছেন ভিন রাজ্যের যুবকেরা।

বোর্ড বন্ধ থাকায় বহু সংস্থা তাদের লাইসেন্স নবীকরণ করতে পারছেন না। ফলে কাজ চালিয়ে যেতে হলে আইনগত ত্রুটিও দেখা দিতে পারে। শোভা শুর নামে এক মহিলার স্বামীর কনট্রাকটরি লাইসেন্স ছিল। স্বামী হঠাৎ মারা যাওয়ায় মহিলাটি কনট্রাকটরি লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু বোর্ডের কাজকর্ম বন্ধ। তিনি লাইসেন্স পাচ্ছেন না। বিধবা মহিলা প্রায়ই এই অফিসে এসে অফিসারদের ধরে কান্নাকাটি করেন। এরকম বহু যুবকও এখানে এসে ধর্না দিচ্ছেন। এদিকে নতুন লাইসেন্স, নবীকরণ প্রভৃতি খাতে যে ফি নেওয়া হয়, বোর্ড বন্ধ থাকায় তা হচ্ছে না। সমস্ত ক্যাটাগরীতে বছরে প্রায় ১২ হাজার আবেদনকারী লাইসেন্সের জন্য পরীক্ষা দেন। সুতরাং বছরে লক্ষাধিক টাকা সরকারের রাজস্বে জমা পড়ে। কনট্রাকটর দুজন যেমন হাজার হাজার বেকারকে বিপদে ফেলেছেন তেমনি সরকারের একটি আয়ের উৎসও বন্ধ করে রেখেছেন। অথচ এ ব্যাপারে মামলার জন্য গাড়ির তেল খরচ হচ্ছে, সময়ের অপব্যয়ও হচ্ছে।

এই কনট্রাকটর দুজন কে ? জানা গেল যে একজন হলেন, মিডল্যান্ড ইলেকট্রিক কোম্পানির মালিক জি এল সিনহা এবং অপরজন হলেন ডি কে সরকার। এই দুজন কনট্রাকটর বহু বৎসর যাবৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের সদস্য কিন্তু সরকার বর্তমানে এই দুজনকে তাঁর বোর্ডের সদস্য পদ দিতে চান না। অবশ্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে তাদের চিরদিন বোর্ডের সদস্য করে রাখতে হবে। কিন্তু উক্ত দুই সদস্য, বোর্ডে কেন তাদের সদস্য পদ দেওয়া হবে না বলে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। ইতিমধ্যে তাদের বাদ দিয়ে বোর্ড গঠিত হল কিন্তু উক্ত দুই কনট্রাকটর বোর্ডের কাজকর্ম যাতে চালু না করা যায় তার জন্য ইনজাংশন জারী করে চলেছেন।

এখন প্রশ্ন উক্ত দুই কনট্রাকটর জি এল সিনহা এবং ডি কে সরকার মহাশয়ের কাছে মানবিকতারও কি কোন স্থান নেই ! তাদের এই ইনজাংশনের ফলে যেখানে হাজার হাজার যুবকের ভবিষ্যৎ বিপন্ন, যে লাইসেন্সের সঙ্গে রুটি-রুজীর প্রশ্ন জড়িত, সেখানে বোর্ডের সদস্যপদের সঙ্গে তাদের এমন কি স্বার্থ নিহিত আছে যে তাদের বোর্ডের সদস্য পদ দিতেই হবে! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বোর্ডের সদস্যরা এমন কিছু মোটা টাকা পান না। অবশ্য বোর্ডের সদস্যপদ পাওয়া নিশ্চয়ই সম্মানীয় ব্যাপার। তবে কি শুধু সম্মানের জন্য তাঁরা বেকারদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন না এর পেছনে কোন গূঢ় রহস্য আছে ?

অপরদিকে রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ সচিব মহাশয় যদি উক্ত দুই কনট্রাকটরের সঙ্গে পেরে উঠতে না পারেন তাহলে অন্তত পক্ষে হাজার হাজার বেকারদের কথা চিন্তা করে এবং রাজ্যের স্বার্থে উক্ত দুই কনট্রাকটরকে আবার বোর্ডে সদস্যপদ দিয়ে বোর্ডটি চালু করে দিতে পারেন। বোর্ড চালু হলে বহু লোকের উপকার হবে। কারণ বোর্ডের সদস্য পদে কারা আছেন তা নিয়ে বেকাররা উদ্বিগ্ন নয়, তাঁরা উদ্বিগ্ন লাইসেন্সের জন্য। যার দ্বারা তারা রোজগারের পথ খুঁজে পাবেন।

এ প্রসঙ্গে রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্তাদের একটি কাজের প্রশংসা না করে পারা যায় না। পশ্চিমবাংলায় যখন হাজার হাজার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বেকার তখন এই দপ্তরে বিদ্যুৎ পরিদর্শক (ইলেকট্রিক্যাল ইনসপেকটর) পদে, ত্রিপুরা থেকে আগত একজন মহিলাকে ডেপুটেশানে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। অথচ এই পদের জন্য মহিলারা যোগ্য ছিলেন না কারণ পরিদর্শনের জন্য যেখানে সেখানে যাওয়া যা পুরুষদের পক্ষে সম্ভব তা মহিলাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই মহিলাকে এখানে আনার ব্যাপারে বিভিন্ন মহল থেকে আপত্তিও করা হয় কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তারা সে সমস্ত আপত্তি গ্রাহ্য করেননি। মহিলারা এই পদের জন্য যোগ্য নন এই রীতি সংশোধন করেই হয়তো তাঁকে এখানে নিয়ে এলেন। সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, একজনের জন্য তারা যখন আইন সংশোধন করে তাঁকে এখানে আনতে পারলেন তখন হাজার হাজার বেকারের স্বার্থে বোর্ড খোলাতে তারা যে আরও বেশি তৎপর হবেন এই আশা করা কি বৃথা হবে ?

বর্তমানে প্রায় ১৫ হাজার আবেদনকারী লাইসেন্সের জন্য আবেদন করে বোর্ড খোলার প্রতীক্ষায় আছেন। যেখানে আজ ঘরে ঘরে বেকার, সেখানে এই বোর্ড বন্ধ থাকাটা শুধু অভিশাপই নয়, অদূর ভবিষ্যতে এর পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে। □

শম্ভুনাথ মাহাতো

রাজনীতিতে সমাজ-বিরোধীরা

ভারতের রাজনীতিতে এখন একটা অংশ জুড়ে বিরাজ করছে কুখ্যাত গুন্ডা, ডাকাত, আর সমাজবিরোধীরা। উত্তরপ্রদেশ আর বিহারের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে এরা এবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এইসব গুন্ডা নেতাদেরকে কংগ্রেস থেকেও মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। উত্তর প্রদেশের কারনেলগঞ্জ, শহিদ্দুল্লা, উত্তর বারানসী, বান্দা সহ আরো অনেকগুলি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এমন বহু প্রার্থীর বিরুদ্ধে আদালতে ভূরি ভূরি মামলা চলছে। এইসব প্রার্থীদের বিরুদ্ধে চুরি-ডাকাতি থেকে শুরু করে নারী আহরণ, ধর্ষণ, হাসপাতালের নার্সের সঙ্গে অভদ্র অশালীন আচরণ, দাঙ্গা-মারপিট, বিমান ছিনতাই – সমস্ত রকমের কুকীর্তির অভিযোগ আছে। শুধু যে কংগ্রেস দলে এমন প্রার্থীদের ভিড় তা নয় কিন্তু, দলিত মজদুর কিসান পার্টি (ডি. এম. কে. পি.), রাষ্ট্রীয় সঞ্জয় মঞ্চ, কেউ কেউ আবার নির্দল প্রার্থী হিসেবেও দাঁড়িয়েছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যকর ঘটনাটি হল যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী তালিকাতেও এমন কুখ্যাত ব্যক্তিদের নাম দেখা গেছে যাদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু মামলা যুক্ত।

□ নিজস্ব প্রতিনিধি,

মানুষ মানুষের জন্য

গৌতম সরকার

ইয়ংমেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নিরলসভাবে কাজ করে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চান নিজেদের আদর্শকে। পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৮৫ সাল আন্তর্জাতিক যুববর্ষ সমগ্র বিশ্বে পালিত হচ্ছে। ১২ই জানুয়ারী ঘোষিত হয়েছে যুববর্ষের যুবদিবস। যদিও ভারত সরকারের কর্মসূচী একবার মাত্র টেলিভিসনের পর্দায় ঝলক মেরেই অস্তমিত, তথাপিও বেসরকারী উদ্যোগে ২২শে জানুয়ারী থেকে ২৮ শে এক সপ্তাহ ব্যাপী এক বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। 'মানুষ মানুষের জন্য' এই শ্লোগানে আকাশ বাতাস মাতিয়ে দিয়ে হাজার হাজার তরুণী তরুণ সমগ্র বিশ্বের প্রায় ১০টি দেশ থেকে আসা সকল মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠ। আয়োজক ইয়ং মেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি যার প্রধান উদ্যোক্তা হচ্ছেন এক প্রাণোচ্ছল যুবক সৌরভ মুখার্জী। শৈশব থেকেই যিনি আপন স্বার্থকে বিশেষ চোখে না দেখে বিভিন্ন মিশনারী সন্তদের সাহচর্যে গড়ে তুলেছেন নিজেকে। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের পড়া অসম্পূর্ণ রেখেই নেমে পড়েন কাজে। বিভিন্ন ধরণের সমাজকল্যাণ মূলক কাজ করার প্রবণতা আসে, ক্যানন এস কে বিশ্বাস, ফাদার বেকারস, মাদার টেরেসার সঙ্গে কাজ করে কাজ শিখে।

ওয়াই এম ডব্লু এস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। তারপর থেকে প্রায় ১১ বছর ধরে এরা কাজ করে চলেছে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায়, যার প্রকৃতি বহুমুখী – যেমন হেলথ অ্যান্ড কমিউনিটি সার্ভিস – যারা নিজ নিজ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কাজ শিখছে – আমাদের দেশের মানুষদের জন্য দরকার একটা সুস্থ ও সবল জনসমাজ কিন্তু পরিবর্তে যা আছে তা হচ্ছে অন্ধকার পরিবেশ, দারিদ্র্য ও ঘৃণা, যার সামগ্রিক উন্নতি দরকার – হেলথ কোরের প্রোগ্রামে মোটামুটি পাঁচ ধরণের ব্যবস্থা আছে – হেলথ এডুকেশন থ্রু অপটিমাম ইউজ অফ লেবার ইনটেনসিভ মেথডস – যারা সেই পুরোনো ধাঁচের ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করে চাইছে এক নূতন ব্যবস্থা, যারা নাটক ও বিভিন্ন পরিদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষিত করে তুলছে, আর এইসব ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের দরিদ্র অশিক্ষিত পরিবারগুলো দলে দলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক বেশি সচেতন হচ্ছে।

চিকিৎসা সহায়ক ব্যবস্থার জন্যে ওয়াই এম ডব্লু এস সংগঠিত করেছে এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে ১৭-২৫ বছর বয়সের তরুণ তরুণীরাই বিশেষভাবে উপযুক্ত – তারা স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বিভিন্ন রকম জনহিতকর কাজ করে চলেছে।

বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্য বিভাগ খোলা হয়েছে, যেখানে ডাক্তার আছে, এগুলি পরিবার পরিকল্পনা থেকে ছোটখাটো রোগের চিকিৎসা চালায়, আবর তারা পানীয় জল, সাধারণ পুষ্টিকর খাবার এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গঠন করতে প্রয়াসী। এরা নিত্যকার ডাটা পঞ্জী যোগাড় করে কতটা উন্নতি হচ্ছে তাও মেনে চলে। জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, এই সমস্ত পরিবার অনুযায়ী ভাবনা চলে।

বিভিন্ন স্কুলে (কাছাকাছি অঞ্চলে) বিভিন্ন শিক্ষার সহযোগী উপকরণ নিয়েও শিক্ষকদেরকে বোঝানো হয় এবং চিকিৎসকগণ তাদের প্রতি কার কোন্ ওষুধপথ্য

স্বনির্ভর হয়ে ওঠার পথে

দরকার সে বিষয়ে মনোযোগ দেন, শুধু চিকিৎসার ওপরই সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নির্ভর করে না – এর জন্য দরকার প্রতিটি মানুষের সহযোগ ও তার মাধ্যমে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও জীবাণুমুক্ত করে রাখা। এবং সেকাজের জন্য এরা যথেষ্টভাবে জনগণকে সচেতন করে তুলেছে। কিছুদিন হল সি এম ডি এ এ ব্যাপারে এদের নির্দিষ্ট অঞ্চলেও কাজ করছে।

ভারতের একটি বৃহৎ শিল্প সংস্থা ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন এগিয়ে এসেছে ওয়াই এম ডব্লু এস-কে সাহায্য করতে, তাদের কলকাতায় বিভিন্ন পৌর অঞ্চল ও বস্তি অঞ্চলের মাঝে এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় যেসব গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে সেখানেও তারা দিয়েছে চিকিৎসক দল সহ দুটি মোবাইল ভ্যান। বিভিন্ন ধরণের পোশাক পরিচ্ছদ, গায়ের কম্বল, খাদ্য কণা প্রভৃতি দুঃস্থ বস্তি অঞ্চলে এরা কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন সংস্থা থেকে ব্যাপক সাহায্য পায় এই সংস্থাটি। বিভিন্ন শিল্প সংস্থা, দেশী বিদেশী বিভিন্ন মানুষের সাহায্য দানে পুষ্ট এই সংগঠনটি – কিন্তু এ ব্যাপারে এই সংস্থার প্রধান, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট সৌরভ মুখার্জীকে প্রশ্ন করতে তিনি বলেন –

প্রঃ বিদেশী সংস্থাগুলো যে হারে সাহায্য করে তা কি একেবারে নিঃস্বার্থভাবেই করে?

উঃ বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত সমাজকে একটা সবভাবিক পর্যায়ে আনার জন্য আর্থিক সাহায্য করে, কিন্তু তারা বিভিন্ন অনুদান দেবার পর আর সেদিকে বিশেষ নজর দেয় না। কারণ তাদের অঢেল টাকা অথচ বেশিরভাগই দেখা যায় সে টাকাটির সঠিক খরচ হয় না। কারণ হঠাৎ করে গড়ে ওঠা শতাধিক এরকম সোশাল ওয়েলফেয়ার সংস্থাগুলো কোনো কনস্ট্রাক-টিভ ওয়ার্কে এ টাকা খরচা না করে যা করে তা মোটামুটি সকলেই জানে, আর তার ফলশ্রুতি যারা কাজ করতে চাই তাদের আর্থিক ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া।

প্রঃ আচ্ছা বিভিন্ন সংস্থার বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকার সঠিক হিসেব দাখিল না করতে পারার জন্যে যে সব কমিশন নিযুক্ত হয়েছে তার ফলে আপনাদের কাজ করতে অসুবিধে হয় না?

উঃ না, কারণ তার পাঁচটা বাজারি সংস্থার মত আমাদের ওয়াই এম ডব্লু এস নয় – আমরা যেরকম মাদার টেরিজার স্নেহধন্য সেরকমই একাধিক বস্তির দরিদ্র দুঃস্থ ব্যক্তির পরিপূর্ণ সহায়তাও পাই। আমরা যেমন তাদের পাশে আছি তারাও তেমনি আমাদের পাশে – আমরা যেসব সাহায্য পেয়েছি তা খরচ করেছি ভবিষ্যতে নিজের আয়ে দাঁড়িয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে – আজ মোটামুটি তারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে এবং এভাবে চললে প্রাথমিকভাবে একটা সাহায্য পেলেই চলে কারণ আমাদের চারপাশে যে ন্যাচারাল রিসোর্সেস আছে তাকে কাজে লাগানোর মত সাধারণ বুদ্ধি যাদের আছে তারা অন্তত লোন করে বা দান গ্রহণ করে সে পয়সা দিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা করতে পারে না।

বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন সেখানকার মানুষদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা এবং এই সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যা বুঝলাম তার থেকে এটাই আশা করা যায় যে আর পাঁচটা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা যদি এরকম হতে পারত তাহলে একাধারে নগরজীবনের এই দূর্দশা, সামগ্রিক জীবনের এই অস্থিরতা এবং সমস্ত স্তরের মানুষদের স্বাভাবিক সুস্থ জীবন কত সহজে ফিরে আসতে পারত। □

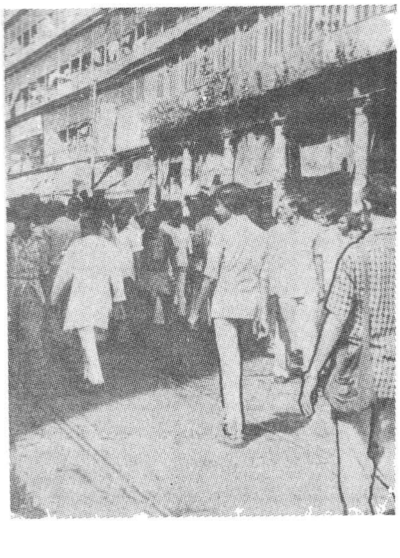

সংবাদ-সাহিত্য

অভিজ্ঞতা

"ভায়া,

অনেকদিন গণপতি গজানন গণেশায় নমঃ করতে পারি নি। তামাম উত্তরবঙ্গ জুড়ে সাড়ম্বর সফর (সফরী ফরফরায়তে নয়) করছিলাম। কারণ কী তা পরে জানাব। গণেশ অ্যাভিনিউয়ের দিকে মন পড়ে ছিল, কাজের চাপে মনের দাবিকে উপেক্ষা করতেই হল। যা হোক প্রত্যক্ষ জ্ঞানে লব্ধ অতি আশ্চর্য একটা কাহিনী তোমাদের শোনাতে চাই। ভক্তিভরে শ্রবণ করঃ

শিলিগুড়ি থেকে বাসে কলকাতা ফিরছি। মধ্যরাত্রে একটা সুগভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে সীটে দেহটাকে পরম আরামে এলায়িত করে 'হনুমানের স্বপ্ন' [পরশুরামের নয়] দেখছিলাম – আমি হনুমান, শ্রীরামচন্দ্রের পাদপীঠে সম্পূর্ণ গন্ধমাদনটাকেই এনে ফেলেছি, লক্ষ্মণ চিত হয়ে আছেন, বিশল্যকরণী বাছা হচ্ছে... বাসটা প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে একটা উঁচুনীচু ধানক্ষেত টাইপ মাঠের মধ্যে ঘষটাতে ঘষটাতে অনেকক্ষণ চলল। তন্দ্রা তো কাটলই, সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে দেখি গলা কাটার উপক্রম। ভোজালি নিয়ে যমদূতের মত একজন আমার গলার কাছে ধরে আদেশ করছে, টাকাপয়সা যা আছে দিয়ে দাও। গোটা বাস জুড়ে হৈ-হৈ ধুন্ধুমার কান্ড -- প্রাণভয়ে কান্নার আওয়াজ আট দশটি বামাকণ্ঠে। দেখলাম প্রায় পনেরোটি দস্যু আমাদের ঘিরে ধরেছে। আমার কাছে তেত্রিশ টাকা সত্তর পয়সা ছিল, নির্দ্বিধায় দিলাম। সোনার গয়না কেউ পরে না আজকাল, ঘড়ি কলমের ব্যবহারও কম। বাসসুদ্ধ লোক যার যা ছিল দিয়ে দিল। মোহন-সিরিজ খুব ভালভাবে পড়া থাকা সত্ত্বেও কিছু করতে পারলাম না। বয়সে মোহনের আটকায় না, চিরযৌবন তার -- আমার বেলায় অন্যরকম।

কালেকশন পর্ব শেষ হলে বাসের আলোতেই গণনাপর্ব চলল। কিন্তু তারপরেই দেখলাম লুটেরাদের মধ্যে একটা বিরাট উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। একগোছা কারেন্সী নোট, সামান্য কয়েকটি রুপোর গয়না, ঘড়ি হাতে স্বল্পকাল পনেরোটি ডাকাত স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যাত্রীদের মধ্যে আমাকেই প্রাচীনতম দেখে সবকিছু আমার হাতে সমর্পণ করে যা বলল দেহাতী হিন্দিতে, তস্যার্থঃ বাবুজি, আপনাদের সকলকে মিছিমিছি তকলিফ দিলাম। গুণতি-হিসাব করে দেখছি নগদ মাল মিলিয়ে উনিশশোর বেশি কিছুতে হবে না। এ টাকায় আমাদের চলবে না বাবুজি। সামনে খানদানপুর গাঁওয়ের দারোগাবাবুর হিস্যায় বাস লুটের জন্যে রেট বাঁধা আছে দু হাজার টাকা। একশো তো ঘাটাই পড়ে যাবে। আমরা মাফ চাইছি বাবু আপনাদের কাছে। টাকা ফেরত নিয়ে আপনারা চলে যান -- মেহেরবানি করে তিন মাইল আগে খানদানপুর থানায় জানিয়ে যাবেন কি লুট ট্রাই করেও লুট করে নি ওসমানের পার্টি। দয়া করে বলবেন হুজুর। ও শালা দারোগার অনেক স্পাই ইধার আছে, ঘুরছে। বিশোয়াস করুন, এ সব গাছপালা যা দেখছেন, সবই দারোগাকে খবর দেয়।

ডাকাতেরা নেমে গেল। টাকাটা হাতে পেয়ে প্রথমেই আমার তেত্রিশ টাকা সত্তর পয়সা সরিয়ে নিলাম। তারপর পুরুষ স্ত্রীলোক সকলকে একে একে জিজ্ঞেস করে যার যার টাকা পয়সা গয়না ঘড়ি সব দিয়ে দেখা গেল সবাই ঠিক পেয়েছে, কিছুমাত্র কম বেশি হয় নি।

আমাদের বাস খানদানপুরে পৌঁছলে বহুক্ষণ থানার বাইরে অপেক্ষা করে সকালে দারোগার দর্শন চাইলাম। আবার অনেকক্ষণ অপেক্ষা, তারপর দেখা পেলাম -- ছ ফুট বাই চার ফুট বিশাল দেহ, পঁচিশ সেন্টিমিটার লম্বা বিরাট গোঁফ, দেখলাম বেলা নটাতেও গোঁফে দুধের সর লেগে রয়েছে।

রিপোর্ট শুনে খুবই অপ্রসন্ন হলেন দারোগা বাঘানন্দবাবু। আমরা তড়িৎগতিতে কেটে পড়লাম।

বাহাল তবিয়তে বাড়ি ফিরে পাড়ার বাসিন্দা সিনিয়র কেরানী সান্টুবাবুকে ঘটনাটা বলতেই লাফিয়ে উঠলেন ঃ আরে ঠিক এই প্যাঁচে আমিও পড়েছিলাম যে দাদা! কয়েক মাস আগে মোড়ের বাসস্ট্যান্ডে আমার পাঁচ টাকা পকেটমার হল। চোরা পকেটে কিন্তু সত্যি সত্যি দু হাজার মত টাকা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সাতপাঁচ দুর্বুদ্ধি মাথায় জাগল। লোক্যাল থানায় গিয়ে বললাম, মাইনের টাকা আনছিলাম, আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দু হাজার চল্লিশ টাকা পকেটমার হয়েছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন, নইলে..

থানার ও. সি. মনে হল খবরটা শুনে খুব খুশী হলেন! বললেন, দেখছি, হয়তো পেয়ে যাবেন।

খুব আশা হল, পকেটমার ধরা পড়লে বোধ হয় থানার গুঁতোয় তার কাছে দু হাজার পঁয়ত্রিশ টাকার একটা দাঁও মারতে পারব। পকেটমাররা কখনও কখনও বেশ বড়লোক হয়।

চারপাঁচদিনের মধ্যে এক ছোকরা, খুব রোগা বিটকেল চোয়াড়ে চেহারা, প্রায় কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হল। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলল, দাদু, আপনার পকেট সেদিন আমিই মেরেছিলাম। মাত্র পাঁচ টাকার বদলে থানায় দু হাজার চল্লিশ টাকার ফল্স রিপোর্ট করলেন; আমার যে প্রাণ গেল স্যার। দারোগাবাবু জানেন আমারই কাজ, ওই এরিয়ায় ওই টাইম

আমার রিজার্ভ -- উনিই প্রোগ্রাম করে দেন। আমার ওপর অর্ডার, নিয়মমত আদ্ধেক টাকা, মানে হাজার টাকা ওঁকে দিতে হবে। দাদু এই নিন আপনার পাঁচ টাকা। আমাকে বাঁচান, আপনার পায়ে পড়ি। থানায় গিয়ে বলুন যে খোকা পকেটমার পাঁচ টাকা ফেরত দিয়েছে। আপনার রিপোর্ট ফল্‌স ছিল এটা জানিয়ে ডায়েরি তুলে নিন স্যার।

তাই করতে হল শেষ পর্যন্ত।

সান্টুবাবু আর আমার কেস একই রকম ভায়া। ভাবছি সরষের মধ্যে ভূত হলে কী করা যায়! বেশি কিছু বলতে সাহস পাচ্ছি না, শুধু ঘটনার রিপোর্ট তোমাদের জানালাম। থানা পুলিসে চিরদিনই অরুচি। ওদের হাতে ধোয়ামোছা হবার সৌভাগ্য এতকাল হয় নি, বুড়োবয়সে ধোলাই মোটেই পছন্দ নয়। গোপালদা"

স্বাগতম্

গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম, ১০৮ গুড়ুম! ব্যান্ড বিউগিল ব্যাগপাইপ স্যাক্সোফোন ইউনিভক্স রামশিঙায় জাতীয় সংগীত বাজাইয়া স্বাগত জানাইতেছি -- শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পশ্চিম সফরের পর 'পূর্ব পশ্চিম' লইয়া দেশোদ্ধারে নামিয়াছেন।

প্রথম সংখ্যাটি মাত্র দেখিয়াছি। একেবারে শুরুতেই "প্রতাপ মজুমদার মাত্র দেড় মাস আগে সাতষট্টি বছরে পদার্পণ করেছেন। প্রথাগত কারণেই তাঁকে বৃদ্ধই বলতে হবে, কিন্তু তাঁর চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ নেই। শরীর বেশ মজবুত, চামড়ার কুঞ্চন চোখে পড়ে না, যদিও চুল প্রায় সমস্তই সাদা। ...প্রতাপ মজুমদার বাবা তো বটেই, ঠাকুর্দা ও দাদু হয়ে গেলেও সাধারণত ট্রাউজার্স ও হাওয়াই শার্ট পরেন, হাতে ছড়ি নেবার প্রশ্নই ওঠে না।"

দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে -- সংবাদ সাহিত্যের জরাগ্রস্ত অস্থিসারদেহ লেখক ঠিক দুই মাস পরেই সাতষট্টি বছরে পড়িবেন। 'পূর্ব পশ্চিমে'র নায়ক [?] প্রতাপ মজুমদারকে তিনি ঈর্ষা করিতেছেন। কারণঃ

"পর পর দুটি মিনি বাস এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমটি ছেড়ে দিয়ে তিনি দ্বিতীয়টিতে উঠলেন। তার কারণ গোলাপি শাড়ি-পরা একটি যুবতী। তার মুখ তিনি ভালো করে দেখেননি, মেয়েটি ছাতা গুটিয়ে মিনি-বাসের পা-দানিতে একটি পা রাখার পর তিনি দেখলেন লাল রঙের চটি পরা তার একটি পা, ঈষৎ উঁচু হয়ে ওঠা শাড়ীতে ফর্সা, মাখন-কোমল একটি গুলফ, সব মিলিয়ে চমৎকার একটি সামঞ্জস্য। অল্প বয়েস থেকেই তিনি সুন্দর কোনো রমণীকে নির্বাচন করে তার সঙ্গে এক বাসে ওঠেন, এখনো সেই অভ্যেসটি রয়ে গেছে। তাঁর এখন সাতষট্টি বছর বয়েস, তবু এ জন্য তিনি বিবেকের কাছেও লজ্জা বোধ করেন না।"

সংবাদ-সাহিত্য লেখকেরও এই অভ্যাস আছে তবে তিনি অনেক বেশি ধৈর্যশীল, দুটি নহে, প্রয়োজনে পাঁচটি মিনিবাসও ছাড়িয়া দেন। তরুণী বা যুবতী নির্বাচন তিনি অতি সুষ্ঠুভাবে করিয়া থাকেন। গুল্‌ফ তো সামান্য কথা, ফর্সা-কালো সরু-মোটা নানা ধরণের রমণীয় পায়ের আন্দাজ দেড় ফুট নগ্ন সৌন্দর্য তিনি অজস্র দেখিয়াছেন। সংখ্যায় চার হাজার নয়শত বিরানব্বইটি হইবে।

প্রথম সংখ্যার শেষ দিকে দুইটি বন্ধুকন্যা বুলি এবং অলির আবির্ভাব ঘটিয়াছে অনিবার্যভাবে। ইহাদের কোনটি তুরুপের তাস তাহা বুঝিতে সময় লাগিবে। বুলি-অলি বেশি উৎপাত করিলে আমাদের ভরসা খোদ বিকাশকলি।

বানজাই দা নিপ্‌পঁ! ছয়টি সংখ্যায় 'পূর্ব পশ্চিমে'র অন্নপ্রাশন হওয়ার কথা। সেই নিমন্ত্রণ খাওয়ার পর নবজাতকের ঠিকুজি কুষ্ঠির একটা ব্যবস্থা করা যাইবে। আপাতত আঁতুড়ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হজমে সাহায্যের জন্য একটা নির্ভেজাল সোডা।

What is Power?

'I Propose nothing,
I impose nothing,
I am only setting forth!'

"Power cuts in Russia Minister Sacked

MOSCOW, March 24.—The Soviet Power and Electrification Minister, Mr. Petr.S. Neporozhny, was removed from office and replaced by Mr Anatoly Mayorets, Minister for the Electrical Equipment Industry, Tass said, reports AP. The change was announced by Tass a day after Mr. Neporozhny's Ministry had been criticized in a front-page article in Pravda.

From The Statesman 25.3.8:

সারে জহাঁসে আচ্ছা, হিন্দুস্তান হামারা!

পাওয়ারমে শারদ পাওয়ার, পাওয়ার লুম, ম্যান পাওয়ার, পাওয়ার পলিটিক্স, লেকিন...সবসে বড়া হ্যায় পাওয়ার ক্রাইসিস -- ম্যায় পাওয়ারি বাবা বন যানে মাংতা।

বংগালমে জ্যোতিবাবু, পরবীরবাবুকো নমস্কার। চুপচাপ টাইট রহিয়ে।

বিবাহযোগ্য পাত্র–পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়

তথ্যকেন্দ্র

১০, গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট (রাজভবনের সামনে) কলি–১ ফোনঃ ২৩–৪৪৬৭

সম্পাদিকা
মঞ্জুশ্রী তালুকদার এম.এ.
উপদেষ্টা
অরুণ চট্টোপাধ্যায়
এম. এসসি., পি এইচ. ডি.

তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে
বিবাহিত পাত্র–পাত্রীর সংখ্যা

জুলাই ১৯৮২	৮৯৪
জুলাই ১৯৮৩	৯৪৮
জুলাই ১৯৮৪	৯৭২

নিয়মাবলী

১। তথ্যকেন্দ্রের নির্দিষ্ট ফর্মে পাত্র–পাত্রীর সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২ তালিকাভুক্তির জন্য পাঁচ টাকা, সার্ভিস চার্জ মাসে দশ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে ফাইনালাইজেশন ফি দশ টাকা অর্থাৎ প্রথম মাসে মোট পনের টাকা, পরের মাস থেকে দশ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে দশ টাকা দিতে হবে।

৩। রেজিস্ট্রেশনের এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ স্থির না হলে পরবর্তী এক বছর বিনা ব্যয়ে তথ্যকেন্দ্রের সার্ভিস পাবেন।

* **বিশেষ ক্ষেত্রে** Exclusive Service এর ব্যবস্থা করা হয়

**পাত্র–পাত্রীর নির্বাচনের কাজ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ত্বরান্বিত করার Computer Service এর ব্যবস্থা আছে

কয়েকটি মতামত

"সদস্যের সংখ্যা প্রায় বাইশ হাজার ....। যন্ত্রজ্যোতিষী (Computer) এক মিনিটেরও কম সময়ে মনে মনে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কষে জানিয়ে দেবেন কোন্ পাত্রের উপযুক্ত কোন্ পাত্রী আর কোন্ পাত্রীর উচিত কোন্ পাত্রকে বরমাল্যে অভিষিক্ত করা।"

–আনন্দবাজার

The number of wedding under the agency's auspices since June 1972 encourages optimism. From 102 that month the figure has shot up to 408 last January. Bless the bride— and the agency"

—Statesman.

SANIBARER CHITHI [·OL. 1 NO. 23 □ MARCH 30 □ Regn. N ·2168/84 □ Rs. 2.00
WEST BENGAL DECLARATION NO. 202/84

এবার দেখুন কেয়ো-কার্পিন চুল!

এ' চুল আপনি খুলেই রাখুন, বিনুনী বাঁধুন, খোঁপাই করুন, বা যা খুশী তাই করুন

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল

আপনার চুল সুস্থ ও সুন্দর রাখে অথচ চটচটে করে না।

Dey's® যাদের যত্নই আপনার আস্থা

এবার আর আধুনিক সাজে সাজতে হলে মাথায় তেল মাখা বন্ধ করতে হবে না।

কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল আপনার চুলের পুষ্টি যোগায় অথচ মাথায় তেলমাখা চটচটে ভাব আনে না এবার আপনি আপনার সুন্দর পরিপাটি, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুল নিয়ে যা খুশী তাই করুন–বিনুনী বাঁধুন, খোঁপা করুন বা হালফ্যাশন মাফিক চুল খোলাই রাখুন–আপনাকে সমান ভালো দেখাবে। আর কেয়ো-কার্পিনের হাল্কা মিষ্টি গন্ধ আপনাকে সারাদিন সতেজ রাখবে।

১০০ এবং ৩০০ মি.লি. শিশিতে পাওয়া যায়।

CLARION